Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

"সমস্ত দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঘটনা সাক্ষ্য দেয় ধর্মই মানুষকে পতিত, দাস, উপেক্ষিত এবং ঘৃণাস্পদে পরিণত করেছে। ভারতীয় মানবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য কোন কিছুর যদি বেশি নষ্টামি থাকে তবে তা ধর্মের।"

—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গণবার্তা

সম্পাদকীয়	১
মানুষকে বোকা বানানোর চক্রান্ত চলছে	১
দেশে-বিদেশে	২
নারী মুক্তি আন্দোলন...	৩
ভাষা দিবস উদযাপন	৪
২৮ মার্চ সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন	৫
খানাকুলে আর এস পি'র পথসভা	৬
পুঁজিবাদের বিবর্তন (৩)	৭
উত্তর পূর্ব কলকাতা আঞ্চলিক রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির	৮

70th Year 25th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 4th March 2023

সম্পাদকীয়

ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে মমতার চক্রান্ত ব্যর্থ

গত এক দশকে উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বিজেপি এবং তাদের প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রকল্পের সহচর টি এম সি'র দাপাদাপি বেড়েছে। মনে রাখতে হবে উত্তর পূর্ব ভারতের সাত বোন রাজ্য এবং ভারতভুক্তির পরে সিকিমের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। চিন বাংলাদেশ ভুটালের বিস্তীর্ণ সীমান্ত প্রতিরক্ষা, সামরিক শিল্প এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে লুক ঈস্ট নীতি এ্যাক্ট ঈস্ট নীতিতে পরিণত হয়েছে। সরকার তথাকথিত বহুমুখী পরিকাঠামো গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সামরিক যানচলাচলের রাজপথ, সেতু, বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বিদ্যুৎ গ্রিড ইত্যাদি নির্মাণের বাহানায় সামরিক শিল্প নির্ভর অর্থনীতি এবং কর্পোরেট জগতের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ করে দিতে বিজেপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সুতরাং ঐ সব রাজ্যের গণতান্ত্রিক নৈতিকতার অবসান ঘটিয়ে দুর্নীতির অবাধ বিস্তার, বিধায়ক সাংসদ কেনাকাটা, জাতিসত্তার রাজনীতির অনৈতিক উস্কানির মাধ্যমে রাজ্যের শাসক হবার জন্য ডাবল এঞ্জিনের তত্ত্ব প্রয়োগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিজেপি। স্বভাবতই বাম গণতান্ত্রিক রাজনীতির সর্বনাশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির কনিষ্ঠ সহযোগীর ভূমিকায় টাকার থলি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঐসব রাজ্যে।

সদ্য সমাপ্ত মেঘালয় ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের আগে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে অতিসক্রিয়তা এবং পশ্চিমবঙ্গের ধাঁচে কোটি টাকা ব্যয়ে প্রচার মাধ্যমে বিজেপি বনাম টি এম সি'র বাইনারি সামনে এলো। মেঘালয়ে মনে হচ্ছিল এন পি পি জোটের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। এবার অনেক আগে থেকেই বামপন্থীরা এবং দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন দল ও ব্যক্তিরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে দেশবাসীর কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। আগামী ২০২৪ সালে সংঘ পরিবারের আগ্রাসনের চরিত্র গোপন রেখে বিজেপিকে শাসন ক্ষমতায় রাখতে তিনি কিছুতেই ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের সাথে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের জোট গঠন করতে দেবেন না। বিশেষ করে জাতীয় স্তরে কংগ্রেসকে দুর্বল করতে পারলে তিনি এই বাস্তবায়নের পথে কিছুটা এগিয়ে যাবেন। যেমন অতীতে গোয়ার নির্বাচনে কংগ্রেসের পাশাপাশি অন্যান্য দল ভাঙিয়ে সেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিজেপি বিরোধী শিবিরের সম্ভাবনা ধ্বংস করেছেন। এই ধরনের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হলেও তিনি কিছু আঞ্চলিক দলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এবারের ভোটে কিন্তু তাঁর এই প্রকল্প মেঘালয়ে ও ত্রিপুরায় ব্যর্থ। ২০১৮ সালে নির্লজ্জ দুর্বৃত্ত অধ্যুষিত দলটি ভোটে হেরে যাওয়ায় কংগ্রেসের ১২ জন বিধায়ক ভাঙিয়ে নিয়ে এবার ভেবেছিল সরকার গঠন করবে বা প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে। এখানে মমতার চাল ব্যর্থ হল। মাত্র ৫টি আসনে জয়লাভ করতে পারল টি এস সি। বিজেপি মাত্র ২টি। কংগ্রেসের ৫টি। মেঘালয়ের রাজনীতি ভীষণ ঘোলাটে। এন পি পি কার সঙ্গে জোট করে ক্ষমতা দখল করে দেখা যাক।

ত্রিপুরায় বামপন্থীদের এবং কংগ্রেসের ওপর লাগাতার ফ্যাসিবাদী আক্রমণ করেছে বিজেপি। রাজ্যবাসী বামপন্থীদের পাশে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। মমতা এবং অভিষেকের নেতৃত্বে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। শেষ পর্যন্ত তারা 'নোটার' থেকেও কম ভোট পেয়ে ত্রিপুরা থেকেই মুছে গেল। অন্যদিকে বিজেপি জোট দশটি আসন কম পেয়েও ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলো। বামপন্থীরা ও কংগ্রেসের আসনে নেমে এলো ১৪তে। আর এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের কাজটা এগিয়ে রাখল ১২টি আসনে জয়ী সদ্যগঠিত তিপ্রামোথা। দেখা গেছে অন্তত কম করেও বামপন্থীরা এবং কংগ্রেস ১২টি আসন খুইয়েছেন বিজেপির কাছে মাত্র ৫০০ থেকে ১১০০ ভোটে। শুধুমাত্র তিপ্রামোথা ভোট কাটার জন্য। যাহোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্ছ্বসিত—বামপন্থীরা পারেনি দেখে। একেই বলে নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

মোদী ও মমতা ক্রমাগত প্রতারণা করেই চলেছেন
মানুষকে বোকা বানানোর চক্রান্ত চলছে

নরেন্দ্র মোদী দিল্লির সরকার দখল করেছেন ২০১৪ সালে। এই সময়ের আগে মোদী যে সমস্ত জনচিত্তহারী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট চমকপ্রদ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ করা গেল যে সেগুলি পূরণের কোনও চেষ্টা নেই। যেমন ধরা যাক্, ২০১৪'র নির্বাচনী প্রচারে খোলাখুলি বলা হল যে, বিদেশে বিশেষ করে, সুইস ব্যাংকের মতো আর্থিক সংস্থাগুলিতে ভারতের অসাধু ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক নেতারা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ গোপনে সঞ্চিত রেখেছে তা, উদ্ধার করা হবে। বলা হল, এই বিপুল অর্থরাজি ভারতে ফেরৎ নিয়ে এসে সমস্ত ভারতীয়দের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গড়ে পনেরো লক্ষ টাকা করে পৌঁছে দেওয়া হবে। স্বাভাবিক কারণেই বহু দরিদ্র এমনকি, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ এমন 'হাই ভোল্টেজ' প্রচারে মোহিত হয়েছিলেন। বিশ্বাস করেছিলেন যে, মোদী ক্ষমতাই এলেই এতগুলি টাকা অনায়াসে পাওয়া যাবে। সমর্থন করার প্রশ্নে দ্বিধা প্রকাশ করেননি বিপুল সংখ্যক দেশবাসী।

মনে আছে নিশ্চয়ই যে, সেবারে মোদী সোচ্চারে প্রচার করেছিলেন যে সরকারি ক্ষমতা পেলে প্রত্যেক বছর দুই কোটি করে মানুষের জীবিকার সংস্থান হবে। চাকুরি পাবেন বেকার যুবক-যুবতীরা। বেশ চিত্তাকর্ষক কথা। মানুষ অতীতের সরকারগুলি দ্বারা বহুবার প্রতারিত হলেও মোদীর বাচনভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল, এমন দৃঢ় আশ্বাস ছিল যে, পুনরায় প্রতারিত হবার বিষয়টি বহু মানুষ ভাবেন নি। মোদী বলেছিলেন যে, ভারতের সমস্ত কৃষকদের জীবনে নিরাপত্তা দিতে তাদের উপার্জন বহুগুণ বাড়ানোর ব্যবস্থা হবে। তিনি বা তাঁর সঙ্গীসাথীরা লক্ষ্য স্থির করে দাবি করলেন যে ২০১৯-এর মধ্যে দেশের সার্বিক অবস্থা পরিবর্তিত হবে। নতুন ভারত নির্মিত হবে। সংঘ পরিবারের পক্ষ থেকে ঠারে ঠারে বোঝানো হল যে, দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা তো এল ২০১৪ সালেই।

খেয়াল রাখতে হবে যে, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসতেই মোদীর প্রচার বাহিনী, আই টি সেল সমস্বরে চিৎকার করেছিল ২০২২ সালের মধ্যেই সব পালটে যাবে। দেশে আর দারিদ্র থাকবে না। বেকারত্বের চিহ্নমাত্র থাকবে না। জিনিসপত্রের দাম আয়ত্তের মধ্যেই থাকবে এবং কৃষিজীবী মানুষদের বিশেষ সুসময় এল বলে। পুরোনো প্রতিশ্রুতিগুলো ধীরে ধীরে ভুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল। পুরোনো প্রতিশ্রুতিগুলি বদলে নতুন নতুন চমকপ্রদ সব আশ্বাস। বাস্তবায়নের সময়ও পিছিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ, বারবার মোদীর দলকে বিপুল ভোটে জয়ী করলেই সব আশাপূরণ সম্ভব!

এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে মোদী সরকারের স্বৈরাচারী রূপটি বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। সরকারের সমালোচনা মানেই দেশদ্রোহ। হয় সিডিশন আইন অথবা ইউ এ পি এ'র মতো ভয়াবহ আইন মারফৎ বিরোধী স্বরকে স্তব্ধ করার ধারাবাহিক অপপ্রয়াস। এসব থেকে দৃষ্টি সরাতে হিন্দু-মুসলমান বা জাতিগত বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি বেশ সোচ্চারে সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলিতে প্রচারিত। এখন আর পনেরো লক্ষ টাকার প্রসঙ্গ বা বছরে দু'কোটি চাকুরির প্রসঙ্গ নেই। এখন অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ, ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ড ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে বাজার গরম চলবে। এখন লক্ষ্য ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে আবার মানুষকে বোকা বানানো।

এর মধ্যেই সাধারণ মানুষের কাছে যাতে যথার্থ বা বাস্তবধর্মী কোনও সংবাদ যাতে মানুষ জানতেই না পারেন সেজন্য মোদী সরকার একেবারে সংবাদের উৎসমুখেই লাগাম পরিয়ে দেবার সুচারু ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ইদানীং প্রসারভারতী ভারতে ফ্যাসিবাদী আর এস এস-এর শীর্ষ নেতা উমাকান্ত আপ্তে বা বাবাসাহেব আপ্তে এবং কুখ্যাত গোলওয়ালকার প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান সমাচার' সংস্থার সঙ্গে ৭.৬৯ কোটি টাকার বিনিময়ে দু'বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। পি টি আই বা ইউ এন আই দীর্ঘকাল যাবৎ সংবাদ সংগ্রহ করে অন্যসব সংস্থার কাছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পাঠাতো। দূরদর্শন আকাশবাণী সেগুলিই সম্প্রচার করতো। অধিকাংশ বেসরকারি সংবাদ সংস্থাও এই সূত্রের ওপর নির্ভর করতো।

মোদী সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্র আরও স্পষ্ট হল। সমস্ত সংবাদের উৎস এখন থেকে নির্দিষ্টভাবে ফ্যাসিবাদী আর এস এস-এর পছন্দমতো 'সংবাদ' হিন্দুস্থান সমাচার পাঠাবে। অন্য কোনও সূত্র থেকে প্রসার ভারতী আর সংবাদ সংগ্রহ করবে না। গোয়েবলস্ যেভাবে চরম ফ্যাসিবাদী হিটলার জমানায় মিথ্যাকে সত্যি বলি প্রচার করতো, এখন থেকে ভারতেও সেভাবেই হবে। ২০২৪ এর সাধারণ নির্বাচনের আগেই মোদী সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটাতে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করে ফেলেছে। বামপন্থী দলগুলি বিশেষ করে, আর এস পি এমন এক ভয়ঙ্কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি একটি বিবৃতি প্রকাশ করে আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটি এ ধরনের ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

শুধুমাত্র সংবাদ সম্প্রচারে চূড়ান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলাই নয়, ইদানীং মোদী সরকার ধারাবাহিকভাবে দেশের বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে সরকারের অযাচিত সংঘাত বেড়েই চলেছে। নানাভাবে বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যে কোনও অন্যায়কে আইনসম্মত করে দেবার অবচেষ্টা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে মমতা সরকার কলকাতা হাইকোর্টের বিভিন্ন বিচারপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে চলেছে একইভাবে মোদী সরকারও বিচার ব্যবস্থাকে নিদারুণভাবে ব্যতিব্যস্ত করে চলেছে।

১০ মার্চ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সর্বাত্মক ধর্মঘট সফল করুন।

দেশে বিদেশে

উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংসের ব্যাপক আয়োজন বন্ধ হোক

১২২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী বন্যায় এবার ভাসল বাংলাদেশের সিলেট। অকুলপাথারে পড়লেন প্রায় পৌনে এক কোটি মানুষ। নদীকে গুরুত্ব না দিলে, নদীর প্রবাহের উপর অত্যাচার চালালে এমনটা হবেই, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জল সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে, কিভাবে কলকাতা থেকে ঢাকা, করাচি থেকে কলম্বো সর্বত্র গোটা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে নদীকে নর্দমা বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। নদী দখল করে বাড়ি বা কারখানা তৈরি হচ্ছে, বালি তোলা হচ্ছে স্রেফ চটজলদি লাভের জন্য। কিছু তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্য নদীকে বস্তুত খুন করা হচ্ছে।

এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে নদীগুলির প্রবাহপথের চৌহদ্দিতে থাকা অসংখ্য মানুষ সঙ্কটে পড়বেন।

প্রসঙ্গত, কলকাতা সংলগ্ন আদি গঙ্গার (টালির নালা) কথাও উল্লেখ্য। সারা বিশ্বে একটা উদাহরণ, আদিগঙ্গা প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। স্রেফ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেল। অবিলম্বে কিছু একটা করা প্রয়োজন। না করলে কলকাতাও দিনের পর দিন জলবন্দী হয়ে থাকতে পারে।

প্রায় এক দশক আগে চিপকো আন্দোলন খাত সুন্দরলাল বহুগুনাজি তেহরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, প্রকৃতির নিয়মকে উল্টে দেওয়ার এমন স্পর্ধা সামলানো যাবে তো! কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলগুলি নদী সংযুক্তিকরণের মতো আত্মঘাতী পরিকল্পনাকে যাবতীয় সমালোচনা সত্ত্বেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশের তথাকথিত উন্নয়নের নামে, পরিবেশ ধ্বংসের ব্যাপক আয়োজন। অবশ্যই নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প সহস্রাব্দের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এক প্রকল্প। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নতুন ভাবে হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার করে প্রকৃতি দমন বা জয়ের চেষ্টায় বিন্দুমাত্র যথার্থতা নেই। প্রসঙ্গত একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের-উড়াল সমুদ্রাভিমুখী দুই নদীর গতিপথে কৃত্রিম পরিবর্তনের ফলে সর্বনাশ হয়েছে, উড়াল সমুদ্র আজ মৃত সমুদ্র, যেখানে কোনো জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। সমসাময়িক মানব সমাজ আরও অনেক দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট— উপেক্ষিত গরিব মানুষ

গরিব মানুষ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই। বরং বলা ভাল অবস্থার আরও অবনতিই হচ্ছে। প্রতিবছরই ব্যতিক্রমহীন ভাবে অর্থমন্ত্রীরা বাজেট ভাষণে গরিবদের স্বার্থরক্ষার অঙ্গীকার করে থাকেন। খুবই ভাল কাজ, যেহেতু দেশের উল্লেখযোগ্য মানুষ আরও গরিব সম্প্রদায়ভুক্ত, মাথা পিছু আয়, বেকারত্ব, বাসস্থান, খাদ্য সংস্থান ইত্যাদি সূচক হিসাবের মধ্যে নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে দেশের রাজ্যগুলিকে মোট জনসংখ্যার ২৫-৪০ শতাংশই গরিব সম্প্রদায়ের মানুষ। অতিমারির দুই বছর (২০-২২) মুদ্রাস্ফীতির হার ৬.২ শতাংশ, বেকারত্বের হার শহরাঞ্চলে ৮.১ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৭.৬ শতাংশ সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে গেছে। বড় বড় কোম্পানিগুলি ব্যাপক হারে ২০২৩ সালে ছাঁটাই শুরু করেছে, শুধু এদেশেই নয়, বিদেশেও। ব্যাপক কর্মহীনতার হার— শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেরও রেহাই দেয় নি।

ভারতে ক্রমবর্ধমান অসাম্য কতকগুলি বাস্তব সত্য উদঘাটিত করছে, অক্সফ্যামের রিপোর্ট বলছে, ভারতের ৫ শতাংশ বিত্তবান মানুষ দেশের মোট সম্পদের ৬০ শতাংশের মালিক। আর নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষ মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদের মালিক। অপর একটি সূত্র (Inequality Report 2022) অনুযায়ী জাতীয় আয়ের ১৩ শতাংশ ভোগ করছে নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষ। ওপরতলার ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ মানুষদের (৭-১৪ কোটি মানুষ) সম্পদ, ব্যয় করার ক্ষমতা, ভোগের পরিমাণের ওপরই বাজার চলছে। ২০২৩-২৪ সালের বাজেট প্রণেতাদের কাছে জিজ্ঞাসা, মোট জনসংখ্যার নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষদের জন্য তারা কি করেছে, কর্মহীন মানুষদের কাছে, তাদের সমস্যার সমাধানে কোনও বাস্তবানুগ প্রস্তাব রেখেছে কি, যাদের পেটে দুবেলা খাদ্য জুটছে না, তাদের জীবন যন্ত্রণা কমানোর কোনো প্রস্তাব আছে কি এই বাজেটে? বাজেট বক্তৃতায় তার কিছু হদিস পাওয়া যাবে কি? সব প্রশ্নের উত্তরই নেতিবাচক।

২০২২-২৩ সালের বাজেটে গরিব মানুষদের জন্য যে অর্থ-সংস্থানের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, বছরের শেষে সেই অর্থ মুদ্রাস্ফীতির জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। গরিব মানুষদের স্বার্থে প্রস্তাবিত অধিকাংশ প্রকল্পেই প্রস্তাবের তুলনায় বাস্তবে কম অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতিকেই এর জন্য দায়ী করা হয়েছে।

উপরন্তু, জি এস টি বাবদ সংগৃহীত অর্থের ৬৪ শতাংশই নিচের তলার অর্থাৎ গরিব মানুষদের পকেট থেকেই এসেছে। তাছাড়া পেট্রল, ডিজেল, এল পি জি'র উপর কর কমানো হয়নি। সম্ভবত মাননীয়া অর্থমন্ত্রী খেয়ালই করেন নি।

অতিমারির পর, দারিদ্র বেড়েছে, অসাম্য বেড়েছে, কর্মহীনতা বেড়েছে, পুষ্টিহীনতা, রক্তাল্পতা ইত্যাদিতে বিপর্যস্ত গরিব শ্রমজীবী মানুষদের ব্যাপক অংশ। এককথায় গরিব মানুষদের পেটে আঘাত করে অর্থমন্ত্রী তাঁর পবিত্র বার্ষিক কর্তব্য সম্পন্ন করলেন।

দীর্ঘ দেড় ঘণ্টার প্রধানমন্ত্রীর শূন্যগর্ভ ভাষণ

এবারের সংসদের রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ দেড় ঘণ্টার এবং লোকসভা ও রাজ্যসভায় মোট প্রায় তিন ঘণ্টার ভাষণে আর্থিক কেলেঙ্কারী থেকে শুরু করে বেকার সমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে আশ্চর্যজনক নীরবতা বেদনাদায়ক। হতবুদ্ধিকর এবং চরম দায়বদ্ধহীনতার পরিচয়ই বহন করে। রাজসভায় তাঁর দীর্ঘ ভাষণে একবারও বিরোধী পক্ষ থেকে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে বিরোধী পক্ষের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের ৮৮ মিনিটের ভাষণে রাজ্যসভার মাননীয় অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে ৩২ বার বাধা দেওয়া হয়েছে, বিরোধী অন্যান্য বক্তাদেরও কম বেশি প্রায় একই রকম বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা, সংসদের ইতিহাসে এ সম্ভবত এক লজ্জাজনক রেকর্ড।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় তাঁর অতি দীর্ঘ ভাষণে একবারও বর্তমানের মূল সমস্যাগুলি বেকাবত্ব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, লজ্জাজনক আর্থিক কেলেঙ্কারী, রাজ্যগুলির উপর আর্থিক ব্লকেড বা সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি মোদীজি। সাম্প্রতিক এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষা থেকে (২০২৩ সালের জানুয়ারি) জানা যায়, অভূতপূর্ব বেকার সমস্যা আজকের ভারতে সবচেয়ে বেশি দুঃশ্চিন্তার বিষয়। CMIE -র তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে বেকারত্বের হার ছিল ৮.৩০ শতাংশ। বিগত ১৬ মাসের মধ্যে সর্বাধিক। বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানায় এই হার ৩৭ শতাংশ, সারা ভারতে শহরাঞ্চলে কর্মহীনতার হার ১০ শতাংশ। নারী সমাজের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বড় বড় দাবি করলেও নির্মম বাস্তব সত্য, ২০১৭-২০২২-এর মধ্যে দু' কোটি নারী কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এই সব সত্যকে ধামা চাপা যাচ্ছে না। নীতি আয়োগের অনুমান গিগ অর্থনীতিতে বৃদ্ধির হার হবে ২০০ শতাংশ, এক্ষেত্রে বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৭৭ লক্ষ থেকে ২৩৫ লক্ষ হতে চলেছে, কিন্তু এই বিপুল শ্রমজীবী মানুষদের জন্য নেই কোনও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা, এদের বেতন সহ ছুটির ব্যবস্থা অনুপস্থিত। দুর্ঘটনার জন্য কোনও বীমা নেই, নেই কোনও পেনশন প্ল্যান। সংসদের উভয় কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর মোট তিন ঘণ্টার দীর্ঘ ভাষণে একবারের জন্যও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি, এল পি জি সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধি, গত তিনমাসে খুচরা বাজারে মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে ইত্যাদির কোনও উল্লেখ।

জাতীয় অর্থনীতির উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে একটি শব্দও খরচ করা সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী বাজে খরচ বলেই মনে করেছেন। ধান্দার পুঁজিবাদের তাণ্ডব এবং দানবীয় আর্থিক কেলেঙ্কারীর সৌজন্যে এল আই সি এবং এস বি আই-তে লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারীর আর্থিক নিরাপত্তা বিপন্ন হতে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবারের বাজেটে প্রচুর কথা বিনা বাধায় বলার সুযোগ পেলেও এমন অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়গুলিতে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। যে মানুষটি ১২ বছর একটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ পদে আসীন থেকেও অবিজেপি রাজ্যগুলিকে প্রাপ্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে কুণ্ঠা বোধ করছেন না। কেবলমাত্র MGNREGA প্রকল্পেই কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির মোট প্রাপ্য ১০, ০০০ কোটি টাকারও বেশি।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবারের সংসদের উভয় কক্ষের ভাষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন :—"A Bharat whose diversity is even more vivid and whose unity is more unshakeable". প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এই গুরুত্বপূর্ণ শব্দবন্ধটির অর্থই বুঝতে পারেন নি বা উপেক্ষা করেছেন। উপেক্ষা করা হচ্ছে সংবিধানের ২৫ নং ধারা—ধর্মাচরণের অবাধ স্বাধীনতার অধিকার হরণ করা হচ্ছে। সাংবিধানিক মূল্যবোধকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে, বিভেদের মাঝে ঐক্যের সন্ধান করেই যথার্থ দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া যায়—এসব সম্ভবত, প্রধানমন্ত্রীর উপলব্ধির বাইরে—জাতীয় দুর্ভাগ্য!

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশের বিরোধী দলগুলির সীমাহীন দ্বিধা

সরকারের সমালোচক সাংবাদিক, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী, দলিত বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ—ব্রিটিশ আমলে প্রণীত 'সিডিশন' আইনের আওতা থেকে কেউই মুক্ত নন, ভারতের পেনাল কোড বলছে, কোনো ব্যক্তির লেখায়, কথায়, অঙ্গভঙ্গীতে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, অবমাননা, অসন্তোষ, আনুগত্যহীনতা বা বৈরিতা লক্ষ্য করা গেলে তিনি দেশদ্রোহী। আবার এও বলা আছে সরকারের প্রতি ঘৃণা অবমাননা, অসন্তোষ প্রকাশ না করে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা অপরাধ নয়।

১৯৬২ সালে এমন অগণতান্ত্রিক, ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী আইন সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সংশয় প্রকাশ করলেও সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি বিবেচনার ভার নিজেদের উপর না রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকেই বিষয়টি নিষ্পত্তির দায়িত্ব দিয়েছে। কৌতুহলের বিষয়, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই এই আইনের স্বপক্ষে সওয়াল করেছিল, সেখানে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী জমনায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো দলই এই আইন বাতিল করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেনি। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি আসাম, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ যেমন নির্বিচারে এই জনবিরোধী 'সিডিশন' আইন প্রয়োগ করছে, বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলি যেমন পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, রাজস্থান, ঝাড়খন্ডতেও এই আইনের প্রয়োগ কিছু কম হয়নি।

তথ্য অনুযায়ী ২০১৪- ২০১৯-এর মধ্যে এই আইনে অভিযুক্ত মোট ৩২৬ জনের বিরুদ্ধে মাত্র ১৪১ জনের ক্ষেত্রে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, এবং মাত্র ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা গেছে, এতে প্রমাণ হয় অভিযোগগুলির অধিকাংশই ভিত্তিহীন। সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করলেই যদি দেশদ্রোহিতা হয়, তাহলে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ বলে বড়াইটা না করাই উচিত।

বিগত বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের 'সিডিশন' আইনে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার অতি সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে।

প্রশ্ন হল, ক্ষমতাসীন বিজেপি বিরোধী দলগুলি ফ্যাসিবাদী প্রবণতার পরিচয় দিতে যদি কোনো কুণ্ঠা বোধ না করে, কোন নৈতিকতার ভিত্তিতে বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলি বিজেপি'র ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, একদিকে বিজেপিকে অবিরাম ফ্যাসিবাদী গালি দেওয়া হচ্ছে, অপর দিকে নিজেদের খাসতালুকে একই জনবিরোধী আইনের সাহায্যে বিরোধীদের 'টাইট' দিচ্ছেন। বিরোধী পক্ষের এই অসহনীয় দ্বিচারিতায় বিজেপি-আর এস এস-ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন শক্ত জমির উপর দাঁড়াতে পারছে না। ঘটা করে দেশে পঞ্চ সপ্ততিতম স্বাধীনতা জয়ন্তী উৎসব পালন আর একই সঙ্গে সিডিশন আইন, ইউ এ পি এ আইন, আফস্পা ইত্যাদি অস্ত্র দিয়ে জনগণের স্বাধীনতা অপহরণের নিরন্তর অপপ্রয়াস অবশ্যই বেশ কৌতুকের বিষয়।

পাকিস্তান ব্যর্থ রাষ্ট্রের স্থায়ী তকমা পেতে চলেছে কী?

গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান। একদিকে প্রবল মূল্যস্ফীতি অপর দিকে প্রায় তলানিতে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার। গত বছরের বিধ্বংসী বন্যায় দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, অর্থব্যবস্থার উপর যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মূল সঙ্কট এখন বিদেশের কাছে ঋণ, যা পরিশোধের কোনও আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। পাকিস্তানের দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। সৌদি আরব-চিন সর্বত্রই সাহায্যের হাত পাতছে পাকিস্তান সরকার। সমস্যার মূলে না গিয়ে কেবল বৈদেশিক সাহায্য পাকিস্তানকে এই গভীর সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারবে কিনা তা নিয়ে প্রবল সংশয় আছে। পাকিস্তানের অবস্থা এমনই যে, বলা যেতে পারে দিন আনি দিন খাইয়ের মতো। আগামী দিনের কোনও সংস্থান নেই। পাকিস্তানের বর্তমান অর্থব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি কোনও পরিকল্পনা এখন আর সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল, পাকিস্তানের এমন অবস্থা হল কেন?দেশটাতে গণতন্ত্র নেই, শাসন ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর দোর্দন্ড প্রভাব, ফলে নেই কোনও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমের সরকার গঠনের কোনও সুযোগ নেই। ফলে বিনিয়োগের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর বললেও কম বলা হয়।

গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করতে না পারলে গভীর থেকে গভীরতর অর্থনৈতিক সঙ্কট পাকিস্তানকে স্থায়ীভাবে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে।

নারী মুক্তি আন্দোলন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের হাতিয়ার

পার্থসারথি দাশগুপ্ত

এক এক বছর যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক নারীদিবসও ফিরে ফিরে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ছাপ রেখে যাচ্ছে। তাও সমাজের একাংশ নারীপুরুষের মানসিকতায় মাত্র। নারী সমাজের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে অজস্র সমস্যা, যথা বেকারত্ব, কর্মক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীর তুলনায় মজুরি বৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, যৌন হেনস্থা, পথে ঘাটে কর্মস্থলে এমনকি গৃহে-পরিবারে নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অজস্র সমীক্ষা চলছে দেশবিদেশ জুড়ে। মহিলা সংগঠন সমূহ খুবই দায়বদ্ধতার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন এবং সমস্যাগুলি তুলে ধরে আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মূল সমস্যার গায়ে সামান্য আঁচড়টুকু পড়লেও পড়তে পারে অথবা মৌলিক কোনো সমাধানের অভিমুখ এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। বরঞ্চ বলা চলে, কোভিড-১৯ মহামারীর পর্ব দেশে দেশে, গরীব দেশগুলিতে তো বটেই, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও নারী সমাজের সমস্যাগুলি শুধু তীব্রতরই হয়নি, জটিলতর হয়েছে। সমস্যাগুলিতে আরো নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

আবার এইসব সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে তার সম্ভাব্য কারণগুলি খুঁজে নেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় যে 'নারীমুক্তি চেতনা' বা রাষ্ট্রিক ও পারিবারিক পরিসরে নারী সমাজের বৈষম্য ও তাদের ওপর হিংস্র আক্রমণ (বা আগ্রাসনকে) খুব স্বচ্ছ এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করা সম্ভব হচ্ছে তাও নয়। কেউ কেউ এই সমস্যার শেকড় খুঁজে পাচ্ছেন তথাকথিত 'পুরুষতন্ত্র' বা 'পিতৃতন্ত্রের' মধ্যে। আবার পরিবারে সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীসমাজের অবস্থানকে সম্পূর্ণভাবেই শ্রেণিগত অবস্থান থেকে পৃথক করে ভাবা হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রেই নয়াউদারবাদী অর্থনীতির প্রবক্তার দল, পুরুষতন্ত্রের যৌন হেজিমনি অর্থাৎ তাদের প্রবৃত্তিগত দোষ গুণকে ভাববাদী চিন্তার মোড়কে ঢেকে উপস্থাপিত করছেন, যাতে পুঁজিবাদের কাঠামোগত সংকটের বিষয়টিকে অস্পষ্ট রেখে জাতপাত, সম্প্রদায়, বর্ণ ও ধর্মীয় সংঘাতগুলির স্থায়িত্ব বজায় রাখা যায়। নারী সমাজের ক্ষমতায়ন ও তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরার প্রসঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠী সহ মহিলা সংগঠনগুলির সমীক্ষায় আমাদের দেশে মোটামুটিভাবে নিম্নোলিখিত বিষয়গুলি উঠে আসে। দারিদ্র, পরিবেশ, কর্মক্ষেত্র এবং গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই সব সমস্যায় যে পার্থক্যগুলি দেখা যায় তা মূলত পরিমাণগত মাত্রায়। গুণগত মাত্রায় নয়।

লিঙ্গগত মজুরি/বেতন বৈষম্য

সারা পৃথিবীতেই একই ধরনের এবং সম সময়ের কাজে নারীরা পুরুষের মতো মজুরি বা বেতন পান না। এমনকি স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলি, যেখানে লিঙ্গবৈষম্য আনুপাতিক হারে কম সেখানেও মজুরি-বৈষম্য রয়ে গেছে। ২০১০ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে লিঙ্গ বৈষম্যজনিত বেতন/মজুরি বৈষম্যের সমীক্ষায় জানা গেছে 'ব্রিকস্' অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি যথা রাশিয়া, ভারত, চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এই বৈষম্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ''মনস্টার স্যালারী ইন্ডেক্স' নামক সমীক্ষার পদ্ধতি প্রকরণে জানা গেছে ভারতে ঐ সময়ে সংগঠিত সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মজুরির ফারাক প্রায় ২৫ শতাংশ। করোনা এবং করোনা পরবর্তীকালে সার্বিক বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং মজুরি হ্রাসের প্রশ্নে নারী শ্রমিক কর্মচারীরা বঞ্চিত হয়েছেন অনেক বেশি হারে। বিশেষ করে, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ বন্টনের যে তথাকথিত লজিস্টিকস্ বিপ্লবের কাল শুরু হয়েছে, যার উপর একতরফা আধিপত্য স্থাপন করেছে আন্তর্জাতিক স্তরের কর্পোরেট ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ, এর প্রভাব নতুন ধরনের কাজের যে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে তার মধ্যে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অনুপাত দ্রুতভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং পাবে। এই ধরনের শ্রমবিভাজনকে যারা পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য রূপে দেখতে চায় তারা, কার্যত মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। বেশি ওজন বহনের শারীরিক ক্ষমতা, নারী শ্রমিকদের ঋতুকালীন ও গর্ভধারণকালীন শ্রম সময়ের তুলনায় পুরুষ শ্রমিকদের থেকে বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করা যায় অর্থাৎ, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট মুনাফার হার হ্রাসকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে এই ধরনের বৈষম্য কর্পোরেটদের কাছে প্রয়োজনীয় বলেই এটি শ্রমের বাজারে স্থায়ী জায়গা পেতে চলেছে।

সারা বিশ্বে এখন অনলাইন ভোগপণ্যের গুদাম থেকে সরবরাহের পাইকারি ও খুচরো বাণিজ্যের দখলদার কর্পোরেট সংস্থাগুলি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহের গুডউইল তৈরির প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। কিন্তু এই তথাকথিত স্বয়ংক্রিয় সরবরাহ ব্যবস্থা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত তেল ও কৃষিপণ্যের সরবরাহের সংকটে ক্রমশ শ্রমজীবী শ্রেণির প্রত্যক্ষ শ্রমের উপর নির্ভরশীলতা বাড়াবে। আর সমুদ্রপথে যেহেতু আন্তর্জাতিক পণ্য সরবরাহের ৬৫-৭০ শতাংশ নির্ভর করে বলে এই দীর্ঘযাত্রায় স্বাভাবিকভাবেই নারী শ্রমিকদের আনুপাতিক হার দ্রুত হ্রাস পাবে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, সন্তান প্রতিপালন এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের বোঝার আশি শতাংশ নারী সমাজের ওপর চেপে বসার জন্য সুপারভাইজরি কাজ এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে মেয়েদের বঞ্চনা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে।

যৌন লাঞ্ছনা এবং সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতার সমস্যা

একথা অনস্বীকার্য যে যতই আমরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথাকথিত প্রগতির কথা বলি না কেন, ভারতে মেয়েদের বাস্তবজীবনে প্রাত্যহিক জীবনচর্যায়, গৃহে-পরিবারে, বিদ্যায়তনে, রাস্তাঘাটে এবং কর্মস্থলে যৌন লাঞ্ছনা বলুন আর হেনস্থাই বলুন, ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সমীক্ষাকারী সংস্থা ও মহিলা সংগঠনগুলি ক্রমাগত এই কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে পড়ছেন।

নিমবাজ (Nimbazz) নামক একটি মেসেজ এবং কলিং নির্ভর মোবাইল অ্যাপের তথ্য বলছে, ৪৭ শতাংশ মহিলা কর্মী মনে করেন তারা কর্মক্ষেত্রে কোনো না কোনো ভাবে যৌন লাঞ্ছনার শিকার বা যৌন হেনস্থার ভয়ে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন।

যৌন লাঞ্ছনার হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, যেখানে, কমপক্ষে দমকল কর্মী কর্মরত, ইন্টারন্যাল কমপ্লেন্ট কমিটি গঠন করে নি অথবা যারা এই কমিটির সদস্য তাঁরা তাদের কাজকর্মের দায়বদ্ধতা ও পরিধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মাত্র ২৫ শতাংশ বহুজাতিক কর্পোরেশন এবং ৩৬ শতাংশ দেশীয় সংস্থায় আই সি সি গঠিত হয়েছে। আর যেখানে আই সি সি গঠিত হয়েছে সেসব সংস্থার সদস্যদের যৌন নির্যাতন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার সমিতি প্রসঙ্গে ফিকি (FICCI)'র সমীক্ষায় জানা গেছে যে মাত্র ৫০ শতাংশ আই সি সি'র সদস্য বিষয়টি সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য-বিধান

আমাদের দেশে জনসংখ্যার কম করেও ৬০ কোটি মহিলা। ১৬ বছরের উর্দ্ধে মহিলাদের মাত্র ২৩-২৫ শতাংশ কোনো না কোনো কাজের ক্ষেত্রে কর্মরত। কর্মরত মেয়েদের সংখ্যা এত কম হওয়ার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কিত সার্বিক উদাসীনতা।

কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ সময়েই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অনুশাসন সমূহ প্রচলন করার ক্ষেত্রে নিস্পৃহ। শারীরিক গঠনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে অনেকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে দৈর্ঘে ছোট হয় এবং তাদের শারীরিক শক্তিও অপেক্ষাকৃত কম। অথচ ভারী কাজ করা অথবা রাসায়নিক দূষণের প্রতিবন্ধকতাগুলি থেকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুস্থ সবল যুবকদের সহনক্ষমতাকেই স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়। ঋতুকালীন বা গর্ভবতী থাকাকালীন সময়ে মেয়েদের সুরক্ষা নিয়ে বহুদশক ধরে শ্রমজীবী শ্রেণি দেশে আন্দোলন গড়ে তুলছে। শুধু মালিক পক্ষের তরফ থেকেই নয়, বিভিন্ন সমাজে ঐসব সময়ে মেয়েদের কাজ করা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অন্ধবিশ্বাস এবং ট্যাবু প্রচলিত আছে। আবার নারীপুরুষের সমানাধিকারকে অনেকক্ষেত্রেই বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে, মহিলা সমাজের বিশেষ শারীরিক সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে ঋতুকালীন ছুটি দেওয়া, গর্ভধারণ ও নিতান্ত শিশু অবস্থায় সন্তান প্রতিপালনের জন্য ছুটি দেওয়া ইত্যাদি ন্যূনতম অধিকারসমূহ কেড়ে নেওয়ার সমর্থকও শুধু মালিকপক্ষ নয়, সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্তদের মধ্যেও কম নেই।

পথে ঘাটে এবং পরিবহনে যাতায়াতে নিরাপত্তাহীনতা

এই সমস্যাটি ক্রমশই দুরপনেয় আকার ধারণ করছে। ইদানীং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শিফট্ ডিউটিতে যাতায়াতের সময় মহিলা কর্মচারীদের অনেকেই অনেক ধরনের বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর রাত যত গভীর হয় অধিকাংশ মহিলা কর্মচারীরা চরম নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় ভোগেন। ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, দিল্লীতে প্রভৃতি শহরে কয়েকটি হাড়হিম করা নিপীড়ন, ধর্ষণ এবং দুর্ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের কাছে এই সমস্যাটি যথেষ্ট স্বাভাবিকমাত্রায় চলে। ন্যক্কারজনক অভিজ্ঞতা।

পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালন এবং কর্মক্ষেত্রে কাজের ভারসাম্য রক্ষার সমস্যা

নারী শ্রমিক কর্মচারীদের কাছে বাস্তবিকই গৃহকর্ম এবং পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানো বা উভয় ধরনের কাজের ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। দেশে বিদেশে, সর্বত্রই প্রজন্মে প্রজন্মে একটা অদ্ভুত ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য রয়েছে। চাকরি করুন আর নাই করুন অধিকাংশ গৃহকর্ম যথা ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, রান্নাবান্না করা, জামাকাপড় ধোয়া-মেলা ইস্ত্রী করা এবং সবার ওপরে সন্তান প্রতিপালনের অধিকাংশ দায় মেয়েদের ওপর চেপে বসে আছে। এটাকে অবশ্যই পারিবারিক পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যজনিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকৃত উপরিকাঠামো ছাড়া আর কি বলা যাবে। এই সমস্যাটি মেয়েদের কাছে এত কঠিন হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে, এই প্রতিযোগিতার বাজারে বাধ্য হয়ে সন্তানপ্রতিপালন ও তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার মূল দায়িত্ব নিয়ে মহিলাদের একাংশ চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

সংগঠিত ক্ষেত্র ছাড়াও অসংগঠিত ক্ষেত্র, যেখানে এদেশের প্রায় ৯৪ শতাংশ মানুষ কাজ করেন, সেসব ক্ষেত্রের দুরবস্থা আরও ভয়ানক। পরিযায়ী মহিলা শ্রমিক, কনস্ট্রাকশন ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলা শ্রমিক, ইটভাটা, বিড়ি শিল্প থেকে শুরু করে অসংখ্য ধরনের কুটির শিল্পে মহিলা শ্রমিক কর্মচারীদের সমস্যাগুলি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। শুধু অ-সরকারি সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠী বা মহিলা সংগঠনগুলি নয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিও বিভিন্ন কমিশন গঠন করে সমস্যা সমাধানের কথা বলছে।

বাস্তবে সাত মণ তেল পুড়লেও রাধা কিন্তু নাচছে না। জাতিসংঘের মূলনীতিতে বিশেষ করে, আই এল ও'র সম্মেলনগুলিতে ধর্ম, জাতপাত, বর্ণ, লিঙ্গ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাস্তব এবং আত্মিক উন্নয়নের পরিসরে সমানাধিকারের ওপর বার বার জোর দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় সমস্ত ধরনের লিঙ্গবৈষম্য অবসানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক পরিসরে অংশগ্রহণ, চাকরি, বিবাহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে নারীসমাজের জন্য ঘোষিত ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ রাইটসে।

ভারতের সংবিধানেও মহিলাদের সমানাধিকারের নিশ্চয়তার কথা ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব অধিকার অস্বীকার করছে কর্তৃপক্ষ। এবং সরকার শুধু নীরবই থাকছে না—ধীরে ধীরে অর্জিত অধিকারগুলিও কেড়ে নিচ্ছে। শুধু নারী শ্রমিকদের নয়। এক্ষেত্রে সরকার সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিই সংকুচিত করছে ও কেড়ে নিচ্ছে।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, আমরা আগেও বলেছি যে এই সমস্যায় জর্জরিত সারা বিশ্ব। সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ আমেরিকায় কোভিড-১৯ মহামারী এই সমস্যাটিকে বিশ্ববাসীর কাছে নগ্ন করেছে। ১৯২০ সালে আমেরিকায় নারী সমাজের ভোটাধিকার অর্জনের সঙ্গে একই তালে কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ তথা অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোভিড-১৯ এর

—এরপর ৮ পাতায়

পূর্ব মেদিনীপুর সংবাদ

বামফ্রন্টের ডাকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন।

● নন্দকুমারের ঘটনায় কম. নিরঞ্জন সিহি সহ অন্যান্য কমরেডদের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং দোষী পুলিশ অফিসারদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে।

● গরিব গৃহবধূ আরজুনা বিবির উপর পুলিশের নৃশংস এবং নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

● আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পুলিশের নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমস্ত মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে তার সুব্যবস্থার দাবিতে।

● বামপন্থী নেতা কর্মীদের নামে অজস্র মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিভিন্ন থানায় বামফ্রন্টের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। ময়না থানায় মিছিল ও বিক্ষোভ সভায় আর এস পি দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কম. সুবল সামন্ত, কম. দীপ্তেন্দু সামন্ত, কম. হরিপদ রায়, কম. জগদীশ গাঁতাইত সহ বামফ্রন্টের অন্যান্য কর্মী সমর্থক ও নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ সভায় আর এস পি দলের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কম. সুবল সামন্ত। কম. সামন্ত বলেন ''বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৃণমূল নেত্রী সিঙ্গুরে হাইরোড অবরোধ করে ২৮ দিন ধরে বিক্ষোভ কর্মসূচি, বিধানসভা ভাঙচুর করলেও পুলিশি হয়রানির মুখে পড়েননি। বর্তমানে পুলিশকে দলদাসে পরিণত করেছে তৃণমূল।''

প্রতিনিধি দলে আর এস পি'র পক্ষে ছিলেন কম. দীপ্তেন্দু সামন্ত।

তমলুকে মানিকতলা থেকে তমলুক থানার উদ্দেশ্যে বামফ্রন্টের সুসজ্জিত মিছিল বের হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কম. চন্দ্রশেখর পাঁজা, কম. ঋতা দত্ত, কম. গৌতম পাণ্ডা, কম. নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত, কম. গায়ত্রী মাজী, কম. গৌরাঙ্গ কুইল্যা, কম. রবীন্দ্রনাথ খামরুই সহ অন্যান্য নেতৃবন্দ। মিছিল শেষে বিক্ষোভ সভায় আর এস পি দলের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কম. নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত।

কম. সামন্ত বলেন ''তৃণমূল সরকার হল আদ্যন্ত দুর্নীতির সরকার। জেলায় কোনো নতুন শিল্প হয়নি। সরকারি চাকরি দেওয়ার নাম করে পাড়ায় পাড়ায় দালাল চক্র গড়ে উঠেছে। আবাস যোজনায় বঞ্চিত গরিব শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষদেরকে সঙ্গে নিয়ে নন্দকুমার বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিল বামপন্থী মানুষজন। বিক্ষোভ শেষে যেভাবে বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক কম. নিরঞ্জন সিহি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে নন্দকুমারে দলীয় কার্যালয় থেকে টেনে হিঁচড়ে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তা নিন্দনীয়। আরজুনা বিবিদের ওপর নির্মম লাঠিচার্জ সরকারের ফ্যাসিস্ট ভাবমূর্তিকে তুলে ধরছে। অথচ এই জেলায় শাসক দলের দুর্নীতিবাজ জনপ্রতিনিধিদের পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে না। অবিলম্বে বামপন্থীদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে হলে পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।'' এছাড়া বক্তব্য রাখেন কম. চিন্ত খাঁ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রতিনিধি দলে আর এস পি দলের পক্ষে ছিলেন কম. বৃহস্পতি মাইতি।

কোলাঘাট থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে আর এস পি দলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কম. অসীম সামন্ত, কম. মহসীন আলি, কম. বাদল পাত্র, কম. করুণা চক্রবর্তী, কম. শক্তিপদ সরকার সহ অন্যান্য দলীয় কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ। বিক্ষোভ সভায় আর এস পি দলের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কম. মহসীন আলি। কম. আলি বলেন ''২০১১ সালের আগে রাজ্য পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ছিল। তৃণমূল সরকার পুলিশকে নিতান্ত দলদাসে পরিণত করেছে। অবিলম্বে বামপন্থীদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।'' আর এস পি দলের পক্ষে প্রতিনিধি দলে ছিলেন কম. অসীম সামন্ত।

চণ্ডীপুরে বামফ্রন্টের থানায় ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কম. বকুল জানা, কম. জয়ন্ত জানা, কম. সুবোধ জানা সহ অন্যান্য দলীয় কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ। প্রতিনিধি দলে আর এস পি দলের পক্ষে ছিলেন কম. বকুল জানা প্রমুখ।

ন্যায়সঙ্গত মহার্ঘভাতার দাবি

১২ জুলাই কমিটির ডাকে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকের কাছে বৃষ্টির মধ্যে ডেপুটেশন ও অবস্থান বিক্ষোভ আয়োজন করা হয়েছিল। অবস্থান বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলার নেতা কম. নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত বলেন ''মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রী হিসেবে সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে সরকার ডি এ দিতে পারে না সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই, অথচ আজকে তাঁরর রাজত্বে প্রায় ছত্রিশ শতাংশ ডি এ বকেয়া রয়েছে।

উনি এখন বকেয়া ডি এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করছেন। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজস্থান, কেরল সহ বহু বিজেপি বিরোধী রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় হারে ডি এ দিচ্ছে। সরকার হাইকোর্টে ডি এ মামলায় হেরে যাওয়ার পর আমার আপনার ট্যাক্সের টাকায় রাজ্য সরকার ডি এ আটকাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।

এই তৃণমূল সরকার গত বছর ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা unplanned খাতে ও ১ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকা এন জি ও কে দিয়ে খয়রাতি করছে। সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে একইভাবে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার বঞ্চনা করছে। এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন, সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের বঞ্চনার শিকার হতে হবে। কম. সামন্ত দুই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কম. রাণা ভট্টাচার্য, কম. অশোক দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উক্ত অভিযানকে সমর্থন জানাতে সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কম. সুরঞ্জন সামন্ত, সভাপতি কম. স্বপন রায়, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সাধন ঘোড়াই, কমরেড সুশান্ত মাইতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ইতিহাস বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে মোদী সরকারের অতি সক্রিয়তা

ইতিহাস বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে বেশ কিছু স্থানের নাম, রেল স্টেশনের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিরোধী নেতাদের, ইতিহাসবিদদের আপত্তি খারিজ করে ঐতিহাসিক মুঘল উদ্যানের নাম বদলে করা হয়েছে ''অমৃত উদ্যান''। ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ হবে, এতো সকলেরই কাম্য, মুঘলদের যখন সবই খারাপ, তাহলে তাজমহল বা লালকেল্লাকে তো ভেঙ্গে ফেলতে আপত্তি কোথায়! এ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন প্রবীণ অভিনেতা নাসিরুদ্দীন শাহ। এ বছরের গোড়ায় কর্নাটিকের জনগণের কাছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রামমন্দির নির্মাতা নরেন্দ্র মোদী এবং টিপু সুলতানের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বলেছিলেন। টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন, এতো ঐতিহাসিক ঘটনা। এখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে টিপু সুলতান না রামমন্দির। কৌতুককর ঘটনাই বটে।

শহিদ বেদি আক্রান্ত

১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের পরে পানিহাটিতে প্রথম আর এস পি নির্মিত শহিদ বেদিটি তৃণমূলী গুণ্ডাবাহিনীর লুম্পেনরা ভেঙে ফেলেছে।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৭ এই আট বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে, অসম্ভব বলে কিছু নেই। কংগ্রেসী স্বৈরাচারের সামনে বুকটান করে আন্দোলনের সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন বামপন্থীরা। সে দিনের সেই ঐতিহাসিক আন্দোলন কলকাতার বুকে আছড়ে পড়তে আগরপাড়া উয়ুমপুর খেলার মাঠে (বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন) ছিন্নমূল অঞ্চলের মানুষেরা হাজার হাজার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। পানিহাটি বামপন্থী নেতৃত্ব সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে বেগবান করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। নেতৃত্বদানকারী অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে আর এস পি নেতৃত্বে কম. হরিচরণ দে, ত্রিদিব লাহিড়ী, প্রণতি কুমার রায় (ঝুনু রায়) অমূল্য উকিল, গোপাল চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে মিলে ছোট করে এই শহীদ বেদীটি নির্মাণ করেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে সি পি আই এম এটি বড় আকারে বেদিটি নির্মাণ করেছিলেন। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি তৃণমূলী গুণ্ডাবাহিনী পৌরসভার জে সি বি ব্যবহার করে ভেঙে ফেলে। সি পি আই এম-এর নেতৃত্ব প্রতিবাদ করতে গেলে এরিয়া কমিটির সম্পাদক শুভব্রত চক্রবর্তী সহ বেশ কিছু কমরেডকে মারধর করে,

এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদে ঐদিন বিকালে বামফ্রন্টের নেতৃত্বে এক সুবিশাল মিছিল আজাদ হিন্দ নগর থেকে ঘটনাস্থল হয়ে আগরপাড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে সংক্ষিপ্ত সভার মাধ্যমে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সি পি আই এম-এর পক্ষে কম. মানস মুখার্জি, তড়িৎবরণ তোপদার, গার্গী চ্যাটার্জী, ঝন্টু মজুমদার, আত্রেয়ী গুহ, দালাল চক্রবর্তী, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, শুভব্রত চক্রবর্তী। সি পি আই-এর পক্ষে কম. কল্যাণ ঘোষ দস্তিদার। আর এস পি-র পক্ষে ছিলেন কম. দিলীপ কুমার দে, শঙ্কর ভট্টাচার্য, বাবু গুপ্ত, সঙ্গীতা পাল, পঙ্কজ দাস সহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ।

ভাষা দিবস উদযাপন

নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের উদ্যোগে গত একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয় গড়িয়ার আজাদ হিন্দ পাঠাগারে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এই আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় ছিল। উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি আরম্ভ হয়। এরপর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা সর্বানী ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলতে গিয়ে বলেন যে দ্বিজাতি তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে যেদিন দেশভাগ হয়েছিল সেদিনই এই ভাষা নিয়ে আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল। এই ভাষা আন্দোলনই সৃষ্টি করেছিল আগামী দিনের বাংলাদেশ তৈরির সম্ভাবনা। পৃথিবীতে বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে, ভাষা নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আজকে আমাদের দেশে একইভাবে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সংহতির যে নীতি তাকে নষ্ট করে দিয়ে দেশের সরকার হিন্দি ভাষাকে জাতীয় ভাষা তৈরি করতে চাইছে আর মাতৃভাষাকে ভুলিয়ে দিয়ে এমন এক প্রজন্ম সৃষ্টি করতে চাইছে যা ভয়ংকর। এর বিরুদ্ধে মহিলা সংগঠন তার আন্দোলন জারি রাখবে তাই এই কর্মসূচি। সভার মুখ্য আলোচক অধ্যাপক ডক্টর তুষার চক্রবর্তী প্রথমেই তাঁর আলোচনায় একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, যে ভাষায় মানুষ কথা বলে সেই ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। মাতৃভাষা মানুষের প্রাণের ভাষা। জীবনের সমস্ত আবেগ এবং আকুতি মানুষ মাতৃভাষাতেই কেবলমাত্র সঠিকভাবে ও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারে সেই ভাষার উপর যখন আক্রমণ আসে তখন, বাধ্য হয়ে মানুষ লড়াইয়ে নামে, বাংলাদেশকেও তাই করতে হয়েছিল। আজ যখন আমাদের দেশের রাষ্ট্রশক্তিও একইভাবে ভাষার উপর আক্রমণ নামাচ্ছে তখন, রুখে দাঁড়ানো জরুরি। তিনি আরো বলেন নিজের মাতৃভাষাকে ব্যবহার করার নামে যারা অন্যের মাতৃভাষাকে অপমান করে তাদের বিরুদ্ধেই ভাষা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। নিজের ভাষাকে ভালবাসার সঙ্গে ও মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি অন্যের ভাষাকেও মর্যাদা দিতে আমাদের শিখতে হবে। সেটা অত্যন্ত জরুরি। আজ যে সংকট রাজ্য তথা সারা দেশ জুড়ে তৈরি হচ্ছে তা প্রতিরোধ করা জরুরি। আজকের এই অনুষ্ঠান সেই বার্তাই দিচ্ছে যা অত্যন্ত ভরসার ও স্বস্তির।

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত করেন। সর্বাণী রায় চৌধুরীর নির্দেশনা মুক্তক গোষ্ঠী একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ কবিতার কোলাজ পরিবেশন করেন। এছাড়া সুরাইয়া খাতুন, দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও মুজিবর রহমান অত্যন্ত সুন্দর একটি শ্রুতি নাটক উপস্থাপনা করেন। নীলাঞ্জন মিশ্র, অর্জুন কর ও সুমন মজুমদারের অনবদ্য সঙ্গীত পরিবেশনা অনুষ্ঠানের মান বাড়িয়েছে। এছাড়া অনিতা গুঁইয়ের আবৃত্তি এবং সবিতা গুঁই ও মাধবীরানী দেও সংগীত পরিবেশন করেন। সবশেষে রূপজ গোষ্ঠীর একুশে ফেব্রুয়ারির উপর একটি নৃত্য আলেখ্য পরিবেশিত হয়। চন্দ্রানী বসুর পরিচালনায় ও দিশারী মুখার্জি ও সহশিল্পী বৃন্দের কুড়ি মিনিটের একটি পরিবেশনা শ্রোতৃমন্ডলীকে দীর্ঘক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালনা করেন নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য কমিটির সদস্য গোপা দত্তগুপ্ত।

২৮ মার্চ সারা দেশ জুড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন

গত মাস অর্থাৎ, ফেব্রুয়ারির ১০ ও ১১ আর এস পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিল্লিতে কম. প্রেমচন্দ্রন এম পি'র বাসস্থানেই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২২তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের অধিকাংশই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কোনো কোনো সদস্য উপস্থিত থাকতে না পারার কারণ জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদকের কাছে অনুপস্থিত থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ সভার আলোচ্যসূচি বিস্তারিতভাবে সমস্ত সদস্যদের কাছে প্রায় এক মাস আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে আলোচনা অনেক সহজ হয় এবং সময়ও বাঁচে। এবারের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বস্তুত বিগত বছরের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সভা। দলের সর্বভারতীয় সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, দলের সংবিধানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য দু'একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সভায় উপস্থিত না থাকায় দলীয় সংবিধানের সংশোধন, পরিমার্জন পরবর্তী সভায় চূড়ান্ত হবে বলে সিদ্ধান্ত। ইতোমধ্যে যে সব পরিবর্তন হয়েছে সেগুলি অবশ্যই প্রবহমান বা চালু থাকবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রী সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়। (১) কম. মনোজ ভট্টাচার্য (২) কম. এ এ আজিজ (৩) কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন, (৪) কম. বাবু দিবাকরণ, (৫) কম. তপন হোড়, (৬) কম. পার্থসারথি দাশগুপ্ত, (৭) কম. অশোক ঘোষ, (৮) কম. সুভাষ নস্কর, (৯) কম. শিবু বেবী জন, (১০) কম. শত্রুজিৎ সিং , (১১) কম. আর এস ডাগর।

সভায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে উদ্ভূত অবস্থা সম্পর্কে বিশদে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, দলের সম্মেলনে গৃহীত খসড়া রাজনৈতিক প্রতিবেদনটি যথেষ্ট বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ দলের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে। দলের নীতিগত অবস্থান সম্পর্কে বিশেষভাবে সমস্ত সদস্যদের অবহিত করার দায়িত্ব সমস্ত রাজ্য কমিটিকে যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কোনো শিথিলতা প্রকাশ করা গণ আন্দোলন ও দলের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। দলের তত্ত্ব আদর্শ এবং দৈনন্দিন কর্মসূচিতে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ দলের সমস্ত সদস্যের কাছে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি হওয়া সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি দলের সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করেছে। কম. প্রেমচন্দ্রন বিস্তারিত হিসাব পেশ করেন। বর্তমান সময়ে দল পরিচালনায় দৈনন্দিন আর্থিক সংস্থানের বিষয়টি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল রাজ্যকমিটি প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা করে কেন্দ্রীয় কমিটির ফান্ডে জমা দেবে। অন্যান্য সবকটি রাজ্যেরও এ প্রসঙ্গে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খন্ড, দিল্লি, পাঞ্জাব, অসম, ত্রিপুরা প্রভৃতি সমস্ত রাজ্য কমিটিগুলিকেও নির্দিষ্ট দায়িত্ব বহন করতে হবে। এইসব রাজ্যগুলির প্রত্যেকেই প্রতি বছর দশ হাজার টাকা করে জমা করবে।

একদা প্রখ্যাত দলীয় পত্রিকা 'দি কল' পুনরায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বছরে দু'টি সংখ্যা বুলেটিন আকারে (চার পৃষ্ঠায়) প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কম. মনোজ ভট্টাচার্য অন্যান্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় এই বুলেটিনের সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করবেন। ইংরেজি এই বুলেটিনের দাম প্রতি সংখ্যা দশ টাকা। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচনে দলীয় এবং ফ্রন্টগত বিষয়গুলি আলোচিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে নির্বাচনী প্রচার সম্পর্কিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। এবারের নির্বাচনে আর এস পি'র একমাত্র প্রার্থী (রাধাকিশোরপুর বা উদয়পুর) কেন্দ্রের প্রার্থী কম. শ্রীকান্ত দত্ত'র নির্বাচনী প্রতীক (কোদাল বেলচা) না পাওয়ার বিষয়টিও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে দলীয় সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কম. মনোজ ভট্টাচার্য এবং কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন যত দ্রুত সম্ভব এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা করবেন এবং শ্রীনগরে পৌঁছে এই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির মতে বর্তমান ফাসিবাদী আর এস এস-এর নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার চলছে তা, দেশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে চলেছে। উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে জাতি ও সম্প্রদায়গুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক করে তুলেছে। এক বিষাক্ত পরিস্থিতি। সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করতে এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের মূল অনুসন্ধান করে ব্যাপকভাবে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি।

কিন্তু এমনসব জঘন্য প্রকল্পগুলি অনুসরণ করার পাশাপাশি বর্তমান মোদী সরকারের অনৈতিক এবং জনস্বার্থ বিরোধী অর্থনৈতিক নীতিগুলি সাধারণ জনসমাজের জীবন প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করে তুলছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে লাগাতার এবং সমস্যাটি সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার পথে বড় অন্তরায় হয়ে পড়েছে। রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল সহ সরিষার তেল বা ভোজ্য তেল, চিনি, ডাল, চাল প্রভৃতির দামও গগনচুম্বী। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে স্বল্পসংখ্যক ধনকুবেরদের সহায়তা করতেই ব্যস্ত। এই অবস্থার বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র গণআন্দোলন আরও তীব্রভাবে সংগঠিত করতে হবে।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গেই দেশের সর্বত্র কর্মহীনতার সীমাহীন প্রকোপে যুব সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। স্বাধীন ভারতের জনসমাজকে কখনোই এমন আতঙ্কজনক বেকারত্বের সমস্যা গ্রাস করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী ইদানীংকালেও এই সমস্যা প্রত্যেক মাসেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত জানুয়ারি মাসে যে শতকরা হিসাব সরকার দিয়েছিল, ফেব্রুয়ারি মাসে সেই তুলনায় সমস্যা আরও গভীর। ৭.১৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭. ৪৫ শতাংশ হয়েছে।

ভারত সরকারের তথ্য পরিসংখ্যান সম্পর্কে প্রভূত সন্দেহ রয়েছে। এমন কারচুপি করে তথ্য বিকৃতি অতীতে হত না। মোদী সরকার এ প্রসঙ্গে লাজ লজ্জা পরিত্যাগ করে মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য পেশ করছে। মুম্বাই শহরে সি এম আই ই অর্থাৎ সেন্ট্রার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির সদর দপ্তর। এই সংস্থাটির বিশ্বাসযোগ্যতা আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃত। তাঁরা যে তথ্য পরিসংখ্যান পেশ করে বেকারত্বের সমস্যা সম্পর্কে জানাচ্ছেন তা, মোদী সরকারের তথ্য থেকে অনেক বেশি ভীতিপ্রদ। আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করতে হয় যে, এমন ভয়ানক এক পরিস্থিতিতেও মোদী সরকার নির্লিপ্ত হয়ে রয়েছে। বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে অথবা কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রসঙ্গে কোনও উদ্যোগই নেই।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিতেই লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ। সেসব পূরণ করার কোনও আগ্রহই সরকারের নেই। বরঞ্চ স্থায়ী পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করে প্রশাসনিক কাজ চালানোর অপচেষ্টা চলছে। ভারতে সাধারণভাবে অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় বেশিসংখ্যক কমবয়সী মানুষের বসবাস। অর্থাৎ, এদেশে কর্মক্ষম যুব বয়সের মানুষের সংখ্যা তুলনায় বেশি। সংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত। গ্রামীণ ও শহুরে ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। মোদী সরকার গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্পটিকে গলাটিপে মারার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

এখন তো বেশ পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমানে উদগ্রভাবে অনুসৃত নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা 'জবলেস গ্রোথ' এর ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্থির হয়েছে যে আগামী ২৮ মার্চ আর এস পি'র একক উদ্যোগে সর্বত্র প্রতিবাদী কর্মসূচি সংগঠিত করতে হবে। রাজ্যগুলির রাজধানীতে এবং জেলা সদর দপ্তরগুলিতে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে কর্মসূচি পালন করতে হবে। দলের সঙ্গে যুক্ত সবকটি গণসংগঠনও এই কর্মসূচিতে সামিল হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্থির হয়েছে যে কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতা করবেন কম. পার্থসারথি দাশগুপ্ত, কম. অশোক ঘোষ, কম. তনল মুর্মু এবং কম. রাজীব ব্যানার্জী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও এ প্রসঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন, কম. অশোক ঘোষ, কম. রাজীব ব্যানার্জী নির্বাচন কমিশনের বিষয়গুলি দেখবেন।

বিভিন্ন সময়ে ভারতের নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিভিন্ন ফরমানগুলি যত্নের সঙ্গে লক্ষ রাখতে হবে। সংসদীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বিভিন্ন রাজ্য কমিটির সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। বারংবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও সব কটি রাজ্য কমিটি লিখিত প্রতিবেদন পেশ করে নি এই দুর্বলতা অবিলম্বে দূর করতে হবে।

দলের সঙ্গে যুক্ত গণসংগঠনগুলি যথা পি এস ইউ, আর ওয়াই এফ, ইউ টি ইউ সি এবং এ আই এস কে এস-এর সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ইউ টি ইউ সি'র সর্বভারতীয় সম্মেলন দীর্ঘকাল যাবৎ সংগঠিত করা যায় নি। এই অবস্থাটি আর চলতে দেওয়া যায় না। সভায় আলোচনার পর স্থির হয়েছে যে, আগামী ১ ও ২ জুলাই, ২০২৩ ইউ টি ইউ সি'র সর্বভারতীয় সম্মেলন সংগঠিত হবে। সম্ভাব্য স্থান ত্রিবান্দ্রম (কেরল)। প্রতিনিধি স্তরে সম্মেলন হবে। ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি র সম্মেলন সমাধা করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে। আশা করা যায় যে, সমধিক শৃংখলার সঙ্গে আমাদের শ্রমিক সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সম্মেলনগুলির কর্মসূচি অনতিবিলম্বে শেষ করতে হবে।

১ ও ২ জুলাই 'ইউ টি ইউ সি'র সর্বভারতীয় সম্মেলন শেষ হবার পর ৩ জুলাই পি এস ইউ'র সর্বভারতীয় কমিটির সভা সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভারতের বর্তমান কঠিন ও জটিল সময়ে যুব ও ছাত্র সমাজ নিদারুণভাবে আক্রান্ত। আর এস পি'র মতাদর্শ বহন করার জন্যও এই দু'টি সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। অদূর ভবিষ্যতে ছাত্র-যুব সমাজের সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলা বিশেষ জরুরি। কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে যে, ছাত্র ও যুব সংগঠন আরও তৎপরতার সঙ্গে তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে। আর ওয়াই এফ-এর জাতীয় কমিটির সভা ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কর্মসূচি বাস্তবায়নে আরও গুরুত্ব দেবেন বলে আশা করা যায়।

সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণসভার কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ১০ ফেব্রুয়ারি সংগঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করেছে যে, আগামী অগস্ট ২০-এর মধ্যেই সব কটি রাজ্যে সদস্যপত্র বিতরণ ও সংগ্রহের কর্মসূচি সমাপ্ত করে আগামী নভেম্বর '২৩ এর মধ্যেই সারা ভারত সম্মেলনের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি ভারতের কৃষকদের জ্বলন্ত সমস্যাবলী নিয়ে এককভাবে এবং সম্ভবমতো যৌথভাবে আন্দোলনের কর্মসূচিতে দৃঢ়তার সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে।

সালারে বিক্ষোভ প্রদর্শন

আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও সুষ্ঠু পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবিতে আজ সালারে আর এস পি'র পাঁচ শতাধিক কর্মী সালার কলেজ মোড় থেকে মিছিল করে বিডিও অফিস অভিযান করে বিডিও'র সাথে দেখা করে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। বিডিও অফিসের গেটে চলা বিক্ষোভ সভা থেকে কম. নওফেল মহঃ সাফিউল্লা লুঠেরা দুর্নীতিগ্রস্তদের হাত থেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে তোলার আহ্বান করেন। এছাড়াও এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আর এস পি নেতা কম. জামাল চৌধুরী ও প্রাক্তন বিধায়ক কম. ঈদ মহাম্মদ প্রমুখ।

উক্ত দাবিতে ৮ ফেব্রুয়ারি আর এস পি ভরতপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে প্রায় তিন শতাধিক কর্মী নিয়ে ব্লক অফিস অভিযান করে। আর এস পি নেতা কম. জামাল চৌধুরী, কম. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ভরতপুর বিডিওকে ডেপুটেশন দেয়। এবং বিডিও অফিসের গেটে চলা বিক্ষোভ সভা থেকে রাজ্য কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন কম. নওফেল মহাঃ সফিউল্লা। এছাড়াও এই বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র নেতা কম. চৌধুরী গোলাম মর্তুজা ও যুব নেতা কম. স্বপন ঘোষ।

খানাকুলে আর এস পি'র পথসভা

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি খানাকুলের গৌরাঙ্গপুরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির বিরুদ্ধে এবং মানুষের পঞ্চায়েত গড়ার দাবিতে আর এস পি'র পথসভা হয়। আর এস পি হুগলী জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত বলেন যে, প্রতিদিন কেন্দ্র-রাজ্যের তরজার নাটক চললেও, দুই সরকার একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে খাদ্য, কৃষি, একশো দিনের কাজ, মিড ডে মিলে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। দেশে কর্পোরেটরাজ কায়েম করতে চাইছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা নিয়ে দুর্নীতি করছে। একশো দিনের কাজের আইনি অধিকার থেকে দুই সরকার মানুষকে বঞ্চিত করছে। গ্রাম সংসদ, গ্রাম সভা ঠিকমতো হচ্ছে না। আলু চাষিদের তীব্র সঙ্কটের উল্লেখ করে তিনি রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, আর এস পি কৃষি সমস্যার সমাধানে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে আসছে।

আর এস পি জেলা কমিটির সদস্য ও আর ওয়াই এফ লোকাল সম্পাদক কম. ভাস্কর চক্রবর্তী বলেন যে, ব্লকের কোনো পঞ্চায়েতেই নিয়ম মেনে গ্রাম সংসদ, গ্রাম সভার বৈঠক হচ্ছে না। আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ নিয়ে দুই সরকারই মানুষকে বঞ্চিত করছেন। তাঁতিদের পরিচয় পত্র, সজল ধারার জল সরবরাহ নিয়ে পঞ্চায়েতের ত্রুটির উল্লেখ করে তিনি পঞ্চায়েতে মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনের ডাক দেন। জেলা কমিটির সদস্য কম. কার্তিক পাল নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। পথসভায় সভাপতিত্ব করেন কম. প্রবীর রায়।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি খানাকুলের রামমোহন ২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে পঞ্চায়েতের নানা ইস্যুতে এবং কৃষি সমস্যা নিয়ে মাইক প্রচার ও ছোট পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আর এস পি তামিলনাড়ু রাজ্য কমিটির সভা

গত ২৫ অক্টোবর ভিল্লুপুরমে সাফল্যের সঙ্গে আর এস পি তামিলনাড়ু রাজ্যের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। সম্মেলন শেষে ২৩ জন সদস্যকে নিয়ে রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছিল। জটিলতা দেখা দেয় রাজ্য সম্পাদকের পদ নিয়ে। সেই সময় কম. পি এস হরিহরণকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবার বিষয় স্থির হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি ২৩-এর মধ্যেই রাজ্য কমিটির সভা আহ্বান করে পূর্বোক্ত জটিলতা দূর করা হবে।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি চেন্নাই শহরের গ্যিন্ডি অঞ্চলের একটি হোটেলে তামিলনাড়ু রাজ্য কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজ্য কমিটির প্রায় সমস্ত সদস্যই উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। দলের সাধারণ সম্পাদক এবং কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক তাঁর আলোচনায় বলেন যে, তামিলনাড়ু রাজ্যে মোট ৩৮টি জেলার মধ্যে আর এস পি'র সংগঠন মাত্র ১১-১২ টা জেলায় ঠিকমতো কাজ করছে। আগামী দুই বছর সময়কালের মধ্যেই এই রাজ্যের সর্বত্র সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ছাত্র-যুব সংগঠনে। শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নির্দিষ্ট শৃংখলায় আনতে হবে। কম. প্রেমচন্দ্রন সদ্য সমাপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব দেন।

সভার শেষদিকে কম. রাজা আশীর্বাদমের প্রস্তাব মতো সর্বসম্মতভাবে কম. এ জীবানন্দমকে আগামীদিনের জন্য তামিলনাড়ু রাজ্যের সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

কমরেড রমাপ্রসাদ ব্যানার্জীর স্মরণসভা

আর এস পি হুগলী জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য এবং ইউ টি ইউ সি রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রমাপ্রসাদ ব্যানার্জীর গত ২ ফেব্রুয়ারি জীবনাবসান হয়। আর এস পি চণ্ডীতলা লোকাল কমিটির উদ্যোগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বাকসা সুকান্ত হলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কম. ব্যানার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর দলের আঞ্চলিক সম্পাদক কম. শৈলেন সাঁতরার সভাপতিত্বে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন দলের জেলা সম্পাদক- মণ্ডলীর সদস্য কম. সত্যজিৎ দাশগুপ্ত। স্মরণসভায় জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত বলেন যে, সিমেন্সের মতো সংগঠিত ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়ন থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়ন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম. ব্যানার্জী শ্রমিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের সদস্য ও উপপ্রধানের কাজও নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন। মানুষের সঙ্গে থাকার জন্য তিনি পঞ্চায়েতের কাজে গুরুত্ব দিতেন। তেমনই স্থানীয় ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বলেন যে, পঞ্চায়েত কম. ব্যানার্জীরা যেমনভাবে পরিচালনা করেছেন, আজ তার বিপরীত পথে চলছে। পঞ্চায়েতে মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। গ্রাম সংসদ, গ্রাম সভা গুরুত্ব হারিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই জনবিরোধী, অগণতান্ত্রিক নীতি নিয়ে চলছে। তিনি বলেন যে, বাম ঐক্যকে দৃঢ় করে মানুষের পঞ্চায়েত গড়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. শুভাশিস সিনহা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কম ব্যানার্জীর ভূমিকা আলোচনা করেন। সি পি আই এম নেতা কম. গোপাল রানা, সঞ্জয় চ্যাটার্জী এলাকার বাম আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা আলোচনা করেন। স্থানীয় সমাজসেবী বিচিত্র চ্যাটার্জী সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাজে কম. ব্যানার্জীর ভূমিকার স্মৃতিচারণ করেন। নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের কম. চৈতালী মহিশাল, বাকসা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান কম. পলি মিত্র প্রমুখ স্মৃতিচারণ করেন।

জয়েন্ট কাউন্সিল অব দি স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনস অ্যান্ড ইউনিয়নস-এর একাদশ রাজ্য সম্মেলন

গত ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে (কম. ক্ষিতি গোস্বামী নগর ও ঋত্বিক সদন মঞ্চে (কম. বলাই সরকার, কম. মেঘনাদ সাহা ও কম. চণ্ডীচরণ সাঁতরা মঞ্চ) বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে জয়েন্ট কাউন্সিলের একাদশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই একাদশ রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যব্যাপী বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

১৮ ফেব্রুয়ারী বেলা ২টার সময় লাল পতাকায় সুসজ্জিত এক বিশাল মিছিল বহরমপুর শহর পরিক্রমা করে প্রকাশ্য সভাস্থলে এসে পৌঁছায়। মিছিল চলাকালীন লক্ষ করা যায় শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে লালঝাণ্ডার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ। প্রকাশ্য সমাবেশের শুরুতে সংগঠনের রক্তিম পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সহ-সভানেত্রী কম. ঝুমুর মান্না। উপস্থিত নেত্রীবৃন্দ একে একে শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন। মাল্যদানের পর গণআন্দোলনের শহীদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করে প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শুরু করা হয়।

ঋত্বিক সদনের বিপরীতে প্রখ্যাত মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ ও গণ আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় নেতা কম. ত্রিদিব চৌধুরীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কম. মনোজ ভট্টাচার্য ও কম. অসিত সরকার। প্রকাশ্য সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন আর এস পি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ কম. মনোজ ভট্টাচার্য। কম. ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বর্তমান আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে সমাজের নিপীড়িত মানুষ ও সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তিনি নির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলেন, যে লগ্নিপুঁজির স্বার্থবাহী নয়া উদারবাদের বাস্তবায়ন গণতান্ত্রিক পরিবেশে সম্ভব নয়। পুঁজিবাদের বর্তমান সংকটকালে বিশ্ব পুঁজিবাদ স্বৈরাচারী পথেই চলতে উৎসুক। ভারত কোনো ব্যতিক্রম নয়। মোদী বা মমতা উভয়েই পুঁজিবাদের ক্রীড়নক। সেই সত্যকে মনে রেখেই সরকারী কর্মচারীদের অগ্রসর হতে হবে।

এছাড়াও প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের মুর্শিদাবাদ জেলার সম্পাদক এবং এই সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সহ-সভাপতি কম. অঞ্জনাভ দত্ত, ছাত্র সংগঠন পি এস ইউ'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহঃ সফিউল্লাহ সহ অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। প্রকাশ্য সমাবেশ পরিচালনা করেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা কম. রাহুল মুখার্জী।

প্রকাশ্য সভায় জয়েন্ট কাউন্সিলের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলি যথা, কোঅর্ডিনেশন কমিটি, যুক্ত কমিটি, বীয়ারিং কমিটি প্রভৃতির নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন।

প্রকাশ্য সভার পর ১৭৬ জন প্রতিনিধি নিয়ে শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। প্রতিনিধি সম্মেলনে আর এস পি রাজ্য সম্পাদক কম. তপন হোড় বক্তব্য পেশ করেন। কম. হোড় তাঁর বক্তব্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন বঞ্চনার দিক তুলে ধরেন এবং পাশাপাশি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জোরদার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের বিদায়ী রাজ্য সম্পাদক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন এবং সংগঠনের বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ প্রাসঙ্গিক বছরগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। এই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের উপর প্রতিনিধি সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি এবং জয়েন্ট কাউন্সিলের অনুমোদিত সংগঠনের মোট ৩১ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রত্যেক প্রতিনিধি তাদের আলোচনায় সংগঠনের ও আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবার চেষ্টা করেন এবং আগামীদিনে সংগঠনকে কিভাবে আরো শক্তিশালী ভাবে গড়ে তোলা যায় সেই মতামত দেন। সম্মেলনের শেষে কম. শান্তনু অধুর্য্যকে সভাপতি ও কম. অসিত সরকারকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ৪৫ জনের এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

বর্তমান সময়ে চলমান সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত সম্মেলনে গৃহীত হয়।

পুঁজিবাদের বিবর্তন : একুশ শতকের পুঁজিবাদ (৩)

তুষার চক্রবর্তী

বিশ্বইতিহাসের পটভূমিতে দেখলে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম যেমন ইউরোপে, তেমনি ইউরোপিয় সমাজকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেই পুঁজিবাদ দুনিয়া জুড়ে প্রসারিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ থেকে পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণ যদিও ইউরোপের প্রাক্তন উপনিবেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে উঠে এসেছে। এই পর্বে, মার্কিন সমাজব্যবস্থা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শকে গ্রহণ করে পুঁজিবাদ আরো বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু ইউরোপের প্রাক্তন উপনিবেশ বা পুঁজিবাদী বাজার ও সংস্কৃতির প্রান্তে থাকা দেশগুলিকে অনুন্নত, ব্যর্থ ও আদিম হিসেবে চিহ্নিত করার কৌশল রয়ে গেছে—যাবতীয় পরিবর্তনেও অপরিবর্তনীয়। ইউরোপিয় সাম্রাজ্যবাদীদের মতো সেই দারিদ্র দূরীকরণ ও উন্নয়নের যুক্তিতেই, বিংশশতাব্দীর শেষ দশকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেট পুঁজির নেতৃত্বে, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারকে ব্যবহার করে পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী প্রসার কিভাবে তুঙ্গে উঠেছিল তা আমরা দেখেছি। ভারতেও সেই আগ্রাসনের শিকার হয়েছি আমরা। কিন্তু, পুঁজির এই আগ্রাসন ও পুঁজির বিকাশের মূলসূত্র অটুট থাকলেও ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সারা বিশ্বে পুঁজিবাদের বিদ্যমান চরিত্রে বেশ কিছু বিভেদ ও বৈচিত্রও নজরে আসে। পুঁজিবাদের সেই বিশেষ বিশেষ রূপকেও চেনা দরকার। সেই মোতাবেক কর্মসূচি নির্ধারণ করা দরকার। পুঁজিবাদের বৈচিত্র তাই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুই দিক থেকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক বিচারে পুঁজিবাদের বৈচিত্রের একটি প্রধান উৎস ছিল পুঁজির বিভিন্ন রূপ। অর্থাৎ, বাণিজ্যিক পুঁজি, শিল্পপুঁজি, আর্থিক পুঁজি এবং কর্পোরেট পুঁজি। এদের বর্ণনা এবং রূপান্তরের ব্যাখ্যা মার্কস দিয়ে গেছেন। যদিও পুঁজির এই বিশেষ বিশেষ রূপগুলি এখন আরো বিকশিত ও বিশেষিকৃত হয়ে প্রায় একেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা হিসেবে বিরাজ করছে। পুঁজিবাদের বৈচিত্র্যের এই দিকটি স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য। সেই আলোচনায় আমরা ঢুকছি না। আমরা বর্তমান দুনিয়ায় দেশে দেশে বিদ্যমান পুঁজিবাদের বৈচিত্র্যের শুধুমাত্র একটা দুটো প্রধান দিক উল্লেখ করব।

অর্থনীতির পণ্ডিতেরা দেশ ভেদে অন্তত পাঁচ ধরনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সনাক্ত করেছেন। যার মধ্যে মার্কিন ও নিওলিবারেল মডেল আজকের পুঁজিবাদের প্রধান মডেল। যদিও, এখন তা স্ববিরোধিতার জালে ক্রমশ আটকে পড়ছে। পুঁজিবাদের এই ইঙ্গ- মার্কিন মডেল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বাজার-অর্থনীতিকে মুক্ত রাখাকে সর্বত্র অগ্রাধিকার দেয়। এমনকি মার্কিন নিও-লিবারেল আদর্শে, বাজার রুগ্ন হলে তাদের চাঙ্গা করার জন্য দেওয়া রাষ্ট্রীয় সহায়তাকেও কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ বা শর্তাধীন রাখা যায় না। আর সেই কারণেই, ২০০৭/০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বিপর্যয়ের পর সে দেশের মুখ থুবরে পরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপুল সরকারি ঋণ ও অনুদান দেওয়া হলেও—সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সেইসব রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেশে লগ্নি না করে, সুদের হার বেশি পাবে বলে চিনে লগ্নি করেছিল। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে মন্দা দূর হতে তা কোনো কাজেই লাগে নি। মার্কিন কর্পোরেট ও পুঁজিপতিদের চিনের লাভজনক বাজার থেকে ফিরিয়ে আনাই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সবচাইতে বিরাট চ্যালেঞ্জ। মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ যে একতরফা, এটাই তার একমাত্র কারণ। মার্কিন মুক্ত বাজারের নীতি আজ বহুক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রীয় স্বার্থকেই আঘাত করছে।

মুক্ত-উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতির থেকে একটু ভিন্ন, আজকের দুনিয়ায় পুঁজিবাদের আরেকটি প্রধান রূপ হলো সমন্বয়ী বা কোঅর্ডিনেটেড বাজার অর্থনীতি নির্ভর পুঁজিবাদ। ইউরোপের বেশিরভাগ অংশেই যা এখন বিরাজ করছে। এর মধ্যে, নর্ডিক দেশগুলিতে বিরাজ করছে পুঁজিবাদের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ধাঁচ। এ সব দেশে সরকার সরাসরি মালিকানা, পুঁজি বা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ না করলেও—বাজারের ওপর নাগরিকস্বার্থে কিছু অত্যাবশ্যক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ, সমাজে আয়ের বৈষম্য তীব্রভাবে বাড়তে দেয় না ও নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চাকরির নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত করে। এ সব দেশে পণ্য ও মজুরি দুটিই কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু, সরকার তা সরাসরি করে না। প্রতিষ্ঠান মারফৎ স্বচ্ছভাবে এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করা হয়। পুঁজিবাদকে অংশত চাপে রাখার কাজটা যদিও সরকার বা প্রতিষ্ঠান নয়—গণতন্ত্র, মতপ্রকাশ, সমীক্ষা ও তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়। সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক যার দৃষ্টান্ত। সরকার ও প্রতিষ্ঠানের বহর এ সব দেশে বড়। কিন্তু, রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের আয় ও দুর্নীতি কম। এভাবেই, এ সব দেশে পুঁজিবাদ খানিকটা আর্থিক ভারসাম্য ও সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে পারছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানি ও দুই জামার্নি মিলিত হবার পর সংযুক্ত জার্মানির অর্থনীতি, সমন্বয়ী বাজার অর্থনীতির আরেক দৃষ্টান্ত। জার্মানিতে বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ সরকারী নয়, আবার নর্ডিক দেশের মতো তথাকথিত সেবামূলকও নয়। সরাসরি জাতীয় স্তরে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে মালিকের চুক্তির ভিত্তিতে জার্মানিতে মজুরি নির্ধারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যা অনেকটাই বর্ধিত। যার ফলে সমাজে আর্থিক বৈষম্যে খানিকটা লাগাম থাকে। সমাজে জীবনযাত্রার মানও উঁচুতে বেধে রাখা সম্ভব হয়। এই জার্মান মডেলকে কেউ কেউ খ্রিস্টিয় গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ বা রেইনে-পুঁজিবাদ বলেও উল্লেখ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর রাশিয়া, বেলারুশ, ইউক্রেন সহ দুনিয়ার আরো বেশ কিছু দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কয়েকটি অত্যন্ত ধনী পরিবারের গোষ্ঠী বা আঁতাতের মারফৎ। যা চরম স্বৈরাচারী পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতির উদাহরণ। এদের আলিগার্কিক ক্যাপিটালিজম বা গোষ্ঠীপুঁজিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। গণতন্ত্রের কোনো চিহ্ন বা রেশ এইসব দেশের সামাজিক বা রাজনৈতিক কাঠামোয় এতটুকুও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এশিয়া মহাদেশে জাপান উন্নত পুঁজিবাদী দেশ। আমরা সবাই জানি, কি ভাবে জাপানের অভিজাতশ্রেণি ইউরোপ ও আমেরিকার অনুকরণে স্বেচ্ছায় পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছিল। এক বিশেষ জাপানি ধাঁচের পুঁজিবাদ তাঁরা গড়ে তুলল। অনেক উত্থানপতনের পরেও জাপান এখনো পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদের সেই জাপানি চরিত্রকে বিসর্জন দেয়নি।

জাপানের বাজার ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থে শীর্ষ-পুঁজিবাদীদের দ্বারা সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, যারা একে অপরের সহযোগী। তাই একে সমন্বিত পুঁজিবাদ হিসেবে অনেকেই উল্লেখ করেন। এই collective capitalism হলো মুক্ত প্রতিযোগিতা নির্ভর laissez fair পুঁজিবাদের বিপ্রতীপ। এশিয়ার সমস্ত দেশের আরেকটি গার্হস্থ্ আর্থিক চরিত্র হলো অতিরিক্ত সঞ্চয়ের ঝোঁক। এটা ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি। জাপানেও, যে কোনো অবস্থায়, সঞ্চয় ও তার বিনিয়োগের হার চোখে পরার মতো। এমনটি জাপানে পুঁজিবাদকে অনেকখানি সামাজিক অক্সিজেন যোগান দেয়। জাপানের বাজারের আরেকটি বৈশিষ্ট হলো ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী আস্থানির্ভর সম্পর্ক ও পরিচিতি। জাপানি ভাষায় এই সম্পর্ককে বলা হয় কেইরেত্‌সু। এর ফলে বিদেশি পণ্য জাপানে প্রবেশের সুযোগ পায় না। জাপানে পুঁজিপতিদের সংহতি ও এই পরিচিতি নির্ভরতার ফলে জাপানে মুক্ত বাণিজ্যের নীতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অচল হয়ে গেছে। জাপানের বাজার অর্থনীতির আরেক লক্ষণীয় সামাজিক ভিত্তি হলো সমবায়। যেমন জাপানের কৃষি ও খাদ্যের বাজার নোকিয় নামে এক অতিবৃহৎ সমবায়ের হাতে। জাপানে প্রায় সব নাগরিক যা থেকে খাবার কেনে। এই খাবারের দাম বিশ্ব-বাজারের চাইতে বেশি। জাপানের নাগরিকরা তাদের গড় আয়ের এক চতুর্থাংশ খাবার জন্য খরচ করে। তারা স্বেচ্ছায় জাপানের কৃষকদের সহায়তা করবার জন্যে এই খাবার বেশি দামে কেনে।

আমরা সবাই জানি, জাপানের পুঁজিবাদী উন্নতির মূলে রয়েছে উন্নত-প্রযুক্তির ভোগ্যপণ্য—প্রধানত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির রপ্তানি বাণিজ্য। এই দক্ষতা অর্জন ও বজায় রাখবার জন্য জাপান একদিকে যেমন শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করেছে, তেমনি আবিষ্কারের চাইতে শিল্পে উদ্ভাবনার ব্যবহারের ওপর দিয়েছে অত্যধিক জোর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ ব্যাপারে জাপান সফল হয়েছে ও আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উদ্ভাবনাকে পণ্যে রূপায়িত করার প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েই জাপান পুঁজিপাদের অনুশীলনের ভিত্তিতে জাতীয় আয় উত্তরোত্তর বাড়িয়েছে। যদিও এখন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও চীন এই ব্যাপারে জাপানের প্রতিযোগী। আবার, পুঁজিবাদী সমাজের যাবতীয় অবক্ষয়, অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি জাপানকে সংক্রমিত করতে ছাড়েনি। ফলে, জাপান আত্মহত্যায় দুনিয়ার শীর্ষে।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে চীন। এই রাষ্ট্রটি পার্টি নিয়ন্ত্রিত একদলীয় ও বহুস্তর বিশিষ্ট। বাজার সহ সমগ্র সমাজকে যা নজরদারির মারফৎ নিয়ন্ত্রণ করে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শক্তিতে যা বলীয়ান। চীন সমাজতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থার নামে এই বাজার ও পুঁজিবাদকে সচল রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে শুরু হলেও, প্রায় তিন দশকের বেশি সময় জুড়ে সমস্ত বহুজাতিক কর্পোরেট সুশৃঙ্খল ও কম মজুরির সুযোগ নিয়ে মুনাফা বৃদ্ধির জন্যে চিনে পা রাখে। চিনের কারখানা ও মজুরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ক্রমশ চিনের উদ্যোগী পুঁজিপতিরা চিনের শিক্ষা ও পরিকাঠামো ও রাষ্ট্রীয় সহায়তার সুযোগ নিয়ে বিশ্ববাজারের অংশীদার হয়ে উঠছে। রাষ্ট্র ও পুঁজির যোগসাজসে যাদের ভিত অনেক শক্ত। ঝুঁকি ও ক্ষতি সামলাবার ক্ষমতা প্রায় অপরিসীম। বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও বিশ্বরাজনীতির লাগাম চিনের হাতে চলে যাচ্ছে দেখে আমেরিকা ও চিনের সম্পর্কে বিপাকীয় ফাটল তৈরী হয়েছে। এই ফাটল ধরেছে মার্কিন অর্থনীতিতে, মুক্ত-বাজারের যুক্তিকে বিসর্জন দিতে মার্কিন রাষ্ট্রশক্তিকে তাই চিনের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধের জিগির তুলতে হয়েছে। চিনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে কোন পথ নেবে তা যদিও অনিশ্চিত।

দুটি ঘটনা নিশ্চিত, চিনের উত্থান ও ভারতে বাজার অর্থনীতির প্রসারণ আজকের পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভরকেন্দ্র এশিয়ায় নিয়ে এসেছে। ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্র এশিয়ার বিকাশশীল পুঁজিবাদে ফাটল ধরাতে ভারতকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। সেটা স্বতন্ত্র বিষয়। বর্তমান প্রসঙ্গ যা প্রাসঙ্গিক ও অনস্বীকার্য তা হলো—চিনের সমাজতান্ত্রিক বাজারের অন্তরালে বিকশিত হয়ে ওঠা চিনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ এখন সবচাইতে শক্তিশলী ও আগ্রাসী পুঁজিবাদী শক্তি, যার সঙ্গে তুলনীয় কোনো নিদর্শন আধুনিক বিশ্ব-ইতিহাসে নেই। হিটলারের ফাসিস্ট জার্মানি অর্থনীতিকে এভাবে লাগাম পরাতে এগোয়নি। যুদ্ধ ও মুনাফার লোভে কর্পোরেট বহুজাতিক কোম্পানিরা হিটলারের সহায়তা করেছে আপন গরজে। চীন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অজস্র শিল্প প্রতিষ্ঠান কাজে লাগিয়ে আরো বেশি ক্ষমতা অর্জন করেছে। ইঙ্গ-মার্কিন মুক্ত বাজারের অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে সারা বিশ্বে চিনের বাজার বিস্তৃত। অথচ চিনের অভ্যন্তরীণ বাজার পুরোটাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। চিনের নজরদারি ব্যবস্থাও বিশ্বায়িত। বিশ্বে পুঁজিবাদের ভৌগোলিক আশ্রয় যেমন এশিয়া মহাদেশ, তেমনি কার্যত তার সদর দপ্তর সাংহাই। আর, যার প্রচার দপ্তর বেজিং। এটা কোনো ঘোষণার অপেক্ষা রাখে না। বিংশ শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির মহাশক্তিতে পরিণত হলেও—যেমন সেই সময় তা প্রচার করেনি, অনেকটা সেই অবস্থায় আছে আজকের চীন।

এবার ভারত প্রসঙ্গে আসা যাক। ভারতে পুঁজিবাদের প্রয়োগ উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। পরীক্ষামূলক ভাবে ভারতে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে, পুঁজিবাদের বীজ তারাই বপন করেছিল। রেল ও টেলিগ্রাফ যার দৃষ্টান্ত। সংক্রামক নানা রকম ব্যাধি ও প্রতিকূল জলবায়ুর ভারতবর্ষকে তারা স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্য বলে মনে করেনি। তারা নিজেদের উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে, কম জনবল ও স্বল্পব্যয়ে এ দেশকে প্রযুক্তি দিয়ে শোষণ করা ও দখলে রাখার কৌশল হাতে নিয়েছিল।

—এরপর ৮ পাতায়

উত্তর পূর্ব কলকাতা আঞ্চলিক রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির

বিগত ৬ থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২২ উত্তর পূর্ব কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পদযাত্রা সহ ক্যানভাসে অঙ্কন, বিতর্ক, রক্তদান ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির সহ বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে রূপায়িত হওয়ার পর; গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দলীয় সদস্যদের নিয়ে সারাদিনব্যাপী একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল ‘‘দলীয় সদস্যদের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য’’।

শিবির উদ্বোধন করেন কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কম. দেবাশীষ মুখার্জী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কম. অশোক ঘোষ।

কম. মুখার্জী আলোচনা শুরুতে বলেন এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলেরই জানা আছে ১৯৪০ সালে আর এস পি প্রতিষ্ঠিত হয় এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। সেই সময়ে এদেশে বাম তথা বাম মনোভাবাপন্ন অনেক দল ছিল। তাসত্ত্বেও আর এস পি তৈরি হয়। এখানে উপস্থিত সকলেই জানেন এটা ধরে নিয়েই বলছি দলের সদস্যদের দায় ও দায়িত্ব যেটা আজকের আলোচ্য। তিনি আরও বলেন আর এস পি একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক দল, এবং এ প্রসঙ্গে তিনি মার্কসবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও লেনিনবাদী কৌশলে দল গঠন, দলীয় সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, দলের সদস্য পদ পাওয়া যায় না, তা অর্জন করতে হয়। সেই অর্জন করতে গেলে দুটি দায়িত্ব আছে (১) দলীয় কর্মসূচিগুলিতে অংশগ্রহণ ও তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উদ্যোগী হতে হয়; (২) কেন দল করবো বা দলের উদ্দেশ্য পাশাপাশি সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে করতে হবে। কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, একটা সময়ে ধারাবাহিক ভাবে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক অবস্থার গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হতো। এই আলোচনার টানে একটা সময়ে সমাজের বিশিষ্টজনেরা দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন কারণে এই ধরনের তত্ত্বগত আলোচনা কমে গেছে। কেন দল করার প্রয়োজনীয়তা, এটা যদি কোনো সদস্যর কাছে পরিষ্কার না থাকে, তাহলে একদিন সে হতাশ হয়ে বসে পড়বে।

কম. অশোক ঘোষের আলোচনার শুরুতে কয়েক জন কমরেড প্রশ্ন করেন—আদানির শেয়ার ধস নেমেছে, তার ফলে আমাদের মতো নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের কি আসে যায়। আমরা শেয়ার কিনি না। সেই কারণে আমাদের লাভ লোকসানও নেই। এর উত্তরে কম. ঘোষ বলেন—সাদা চোখে এটা সত্যি। এখানে উপস্থিত যারা আছেন তাঁরা কেউ শেয়ার বাজারে যান না, তার ফলে আমাদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কম। শেয়ার হচ্ছে কোম্পানির মালিকানার অংশ। অবশ্য পুঁজিরও অংশ বটে। এ শেয়ার কেনাবেচা করা যায়। এখানে বিনিয়োগ করে দুই ভাবে লাভবান হওয়া যায়। একটি হচ্ছে ওঠানামার কারণে, অপরটি হচ্ছে কোম্পানির বণ্টিত মুনাফার অংশ, যা লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড হিসেবে দেওয়া হয়। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আদানি তাদের শেয়ারের দাম বাড়িয়ে নিয়ে ছিল। আদানির বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদী এল আই সি ও স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে আদানিদের শেয়ার কিনতে বাধ্য করেছেন। আদানিদের শেয়ার ঐ দুই সংস্থা বেশি দামে আদানিদের কাছ থেকে কিনেছিলো। এখন সেই শেয়ার বিক্রি করতে গেলে অনেক কম দাম পাবে। এই দুই সংস্থায় আপনার আমার টাকা জমা আছে। আমার মনে হয়, এখানে যারা আছেন তাদের প্রত্যেকের জীবন বীমা আছে। এই দুই সংস্থা ডুবলে, আমাদের জমানো টাকাও জলে যাবে। এই আদানিদের সঙ্গে আমাদের জড়িয়ে দিয়েছেন মোদী। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

উভয়ই আলোচিত বিষয়সূচির উপরে ও বর্তমান রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উপরে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করবেন। প্রশ্নোত্তরে শিবির প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। দলীয় সদস্যরা উৎসাহিত হয়।

একুশ শতকের পুঁজিবাদ

৭-এর পাতার পর—

সেই অর্থে ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজদের পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক-কলোনি। পুঁজিবাদ ও প্রযুক্তি কোনোটাই ভারতের সমাজদেহে কোনো রূপান্তর আনেনি। কেননা, সেই রূপান্তর ইংরেজ শাসকেরা চায়নি। শিক্ষা, পরিকাঠামো, প্রতিষ্ঠান ছিল স্বাধীন পুঁজিবাদী বিকাশ ও স্বাভাবিক প্রসারের অনুপযোগী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই বৈজ্ঞানিক কলোনির ভার বহনের ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হারিয়ে ফেলে। ফলে, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হাতবদল ঘটল। কিন্তু, অর্থনীতি ও সমাজ পুরনো খাতেই প্রবাহিত হচ্ছিল। নেহেরু, শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির বিকাশ চাইলেও সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ কোনটাকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। ফলে, ভারতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৮০র দশক পর্যন্ত পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ ছিল অতিমন্থর। সারা বিশ্বের অর্থনীতিবিদরা যাকে ঠাট্টা করে বলত—হিন্দু গ্রোথ রেট। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চাইতেও কম হবার ফলে তা নিশ্চিতভাবেই দারিদ্রের বৃদ্ধি ঘটাত।

মার্কিন সহায়তায় চিনের পুঁজিবাদী পথে যাত্রা ভারতে কংগ্রেস শাসকদের পুঁজিবাদী বিকাশকে দারিদ্র দূরীকরণের পথ হিসেবে ঠাউরে নিতে ভরসা যোগায়। রাজীব গান্ধীর আমলে ভারত পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধিকেই উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে স্বীকার করে নিল। ভারতের সমাজ অর্থনীতি যে পুঁজিবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতে পুঁজিবাদ চলেছে ইঙ্গমার্কিন ফর্মুলায়—খোলা বাজারের রাস্তায়। বৈষম্য ও বেদনা যার মধ্যে অতিমাত্রায় প্রকট। আবার, পশ্চিমে পুঁজিবাদের সংকট ভারতকে তেমন বেকায়দায় ফেলতে পারছে না—এটাও বার বার প্রমাণিত হয়েছে। ভারতে পুঁজিবাদের অন্যতম আশ্রয় তরুণ সম্প্রদায়। ভারতের জনসংখ্যায় যাদের অনুপাত বেশি। পশ্চিমে পুঁজিবাদের যেখানে অন্তিম দশা, সেখানে ভারতে তার প্রলোভন তরুণদের মন জয় করতে পারছে। যদিও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ভারতে পরিকাঠামো এখনো অপ্রতুল, এবং যা আছে— তা সমাজের খুব কম সংখ্যক মানুষের আয়ত্বের মধ্যে। সেই দিক থেকে ভারতে পুঁজিবাদের যাত্রাপথ ও তা নিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের গর্ব সত্যিই বিস্ময়কর।

ধনতন্ত্র একদিকে যেমন জগৎকে বদলে দিয়েছে, তেমনি ধনতন্ত্র নিজেও অনেকখানি বদলেছে। মোটামুটিভাবে ১৯৭০ থেকে ধনতন্ত্রের বর্তমান রূপ ফুটে উঠতে শুরু করে। একে বলা যায় ধনতন্ত্রের পরিণত বা শেষ-পর্ব, ইংরেজিত বলা যায় late capitalism। পুঁজিবাদের মধ্যে এখন যে সব নতুন দিক ও বৈচিত্র বিরাজ করছে—সেটা একদিকে যেমন পুঁজিবাদকে সুস্থায়ী করে তুলছে ও সচল রাখছে—অন্যদিকে তৈরী করেছে দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের নতুন নতুন ক্ষেত্র। পুঁজিবাদ কোনদিনই নিজ থেকেই ধ্বংস হবে না, আত্মহত্যাও করবে না। পুঁজিবাদের মুনাফার চাপে পিষ্ট মানবতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের জন্য এই গ্রহকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে দেশে দেশে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামকে বিকশিত করা ছাড়া তাকে ধ্বংস করার কোনো পথ নেই। পুঁজিবাদের বিদ্যমান নির্দিষ্ট রূপকে সুচিহ্নিত করা এই সংগ্রামের জন্য অপরিহার্য।

নারী মুক্তি আন্দোলন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের হাতিয়ার

৩-এর পাতার পর—

অতিমারী চলাকালীন সময়ে সরকারি বিধি সামাজিক দূরত্ব চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজস্র কর্মরত মায়েরা কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সেখানেও ৪৬ শতাংশ কাজে মেয়েরা কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। এর মধ্যে আবার বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণবর্ণের মহিলা এবং অনাবাসী মহিলা কর্মচারীরা সর্বাধিক বঞ্চিত। এককথায় বলা চলে সারা দুনিয়াতেই দারিদ্রের নারীভবন ঘটেছে।

পুরুষতন্ত্র/পিতৃতন্ত্র আধিপত্য নয় পুঁজিবাদই নারীবিদ্বেষ ও বৈষম্যের মুখ্য কারণ

বাস্তব অবস্থা প্রমাণ করছে যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে কর্মবিভাজনে পুরুষ বনাম নারীর সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল—এই বিষয়টি শুরু থেকেই বুর্জোয়া সমাজের নির্মিত ভাবনা। আবার নারীর সন্তানধারনের বৈশিষ্ট্য এবং পুরুষের অধিকতর শক্তিশালী দৈহিক কাঠামো সহ ব্যথাবেদনা মুক্ত যৌন আধিপত্য পিতৃতন্ত্রের কারণ—এটিও সমস্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থাতেই বিশেষ করে বর্তমান যুগে ক্ষয়রোগগ্রস্ত নয়াউদারবাদী বুর্জোয়া ব্যবস্থাতে—পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামোটাকে টিঁকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। নারীর অধিকার সহ নারীমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে একটু পিছন ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, নারীমুক্তি আন্দোলন সামগ্রিক শ্রেণি সংগ্রামেরই একটি মূল্যবান এক জৈবিক অংশ। শুধুমাত্র নারী শ্রমিকের লড়াই নয়, নয় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক দল ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণার দাবি থেকে শুরু করে, কোপেনহেগেনে এঙ্গেলস-কাউটস্কি প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে মহিলা সম্মেলনের আহ্বান, পরবর্তীতে জার্মান নেত্রী লুইস জেইৎজ এবং রাশিয়ার বিপ্লবী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের উত্থাপিত নারী শ্রমিকের সমবেতন — নিরাপত্তার অধিকার — সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি কখনই শ্রেণি নিরপেক্ষ দাবি নয়। আন্দোলন নয়। পুরুষ শ্রমিক কর্মচারীর সঙ্গে সমান হারে অধিকার অর্জন করে পুঁজি ও মুনাফার অংশে আরো বেশি ভাগ বসালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আঘাত হানা হয়। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ায় সেন্ট পিটার্সবার্গে নারীমুক্তি আন্দোলনের ঢেউ শেষ পর্যন্ত জারতন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তীর্ণ হয়েছিল। রাশিয়ার শ্রমজীবী শ্রেণি সহ দরিদ্র কৃষক ও শোষিত সাধারণ মানুষের সংগ্রামে তীব্র গতি সঞ্চারিত করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত অক্টোবর-নভেম্বরের শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা করেছিল। এরমধ্যে পুরুষতন্ত্রই বা কোথায় —নারীতন্ত্রই বা কোথায়?

অর্থাৎ উৎপাদনসম্পর্ক এবং শ্রেণিচেতনা-নিরপেক্ষ শুধুমাত্র লিঙ্গগত বৈষম্যের নিরিখে নারীমুক্তি সংগ্রামকে দেখা এবং সেই ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক ধারণা। আবার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারী সমাজের ওপর চেপে বসা বৈষম্য ও নিপীড়নের বিষয়গুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াই মূল্যহীন—এটিও সম্পূর্ণভাবে একগোষ্ঠী তথাকথিত মার্কসবাদীদের অবৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারণা। কোনো একটি উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বহু শতাব্দী ধরে সমাজের উপর চেপে বসা সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক্ পুঁজিবাদী সংস্কৃতি, অর্থাৎ উপরি কাঠামোর অবসান হয় না। অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে প্রতিনিয়ত একে অপরের সংঘাত ও টানাপোড়েন চলতেই থাকে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ও অপূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতিবোধগুলির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলতেই থাকে। সুতরাং সেই লড়াই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার থেকে সমাজের গায়ে লেগে থাকা রক্তমাংস নোংরা মুছে ফেলার সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চলবে যতদিন শ্রেণি বিলুপ্তি না ঘটে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-